বরণীয় যাঁরা আদালতে

চিত্রগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ॥ রাস পূর্ণিমা, ১৩৭৯

প্রকাশক ॥ শ্রীমতী ঘোষ ও নীলকমল চট্টোপাধ্যায়

৩৭৯ বি, রবীন্দ্র সরণি।

কলকাতা সাত লক্ষ ছয় এবং

এল আই জি বিলডিং।

ব্লক সি। ফ্ল্যাট নং থ্রি।

৭৯ নং নারকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড।

কলকাতা সাত লক্ষ এগার।

প্রচ্ছদ ॥ মনোজ বিশ্বাস

মুদ্রক ॥ প্রদ্যোৎকুমার মান্না

বিশ্বকর্মা প্রেস ২/১এ আশুতোষ শীল লেন

কলকাতা সাত লক্ষ নয়।

এই কাহিনীর বরণীয়দের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত—

প্রকাশকের প্রতিবেদন

শোনা গিয়েছিল প্রকাশনা সংস্থা করতে গেলে একমাত্র যেটির দরকার হয় সেটি অর্থ। টাকা থাকলে হয়তো অনেক কিছু হয় না কিন্তু প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলা যায়। হয়তো এক সময়ে তাই ছিল। ছিলই, তা হলফ করে বলতে পারি না। কিন্তু এখন ও কথা একেবারে অচল। প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রথম যে জিনিসটি দরকার তা হলো একটা মন। শৈল্পিক মন।

তারপর, ভালবাসা। সবার ভালবাসা আর বিশ্বাস।

দেশের যা কিছু ভাল, যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যা কিছু সর্বকালের জন্য, যা কিছু মহৎ, যা কিছু বিলুপ্তপ্রায়, তা খুঁজে বার করার মত মন। গবেষকের মত ভূমিকা। পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্যের মূল্যায়ণ।

সেকাল ও একালের প্রকাশকদের এই নেপথ্য ভূমিকার কোন মূল্যায়ণ হয় না। প্রকাশকদের ভূমিকা সংবাদ সাহিত্যে শুধু প্রকাশক। ছাপাওয়ালা। এটা কালোত্তীর্ণ একটি ধারা। তার পরিবর্তন আসা দরকার।

এই দরকার মনে করে সম্পূর্ণ শূন্য হাতে যোগমায়া প্রকাশনী'র আত্মপ্রকাশ। সম্বল, ঐ একটা মন। বলা বাহুল্য, একটা জেদ। তার ফলশ্রুতি মাত্র আট মাসে ৫টি বই। 'কুলিকাহিনী' আবিষ্কার, সম্পাদককে অনুপ্রাণিত করে প্রকাশ করার পর পত্র-পত্রিকার সমালোচনা সাহিত্যে এর যে খ্যাতি তাতে আমরা গর্বিত।

এরপর 'সোনার দাগ'। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমরা নিজেরাই ধন্য! আমরা মনে করি, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বিস্তারিত ইতিহাস (১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পথের পাঁচালী পর্যন্ত) শুধু নয়, চলচ্চিত্রের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, যা এই প্রথম লেখা হলো এবং আমরা তার প্রকাশক। 'বরণীয় যাঁরা আদালতে', এই গ্রন্থটিও জন্ম জন্মান্তরের জন্য ধরে রেখেছে এমন কিছু স্মৃতি, এমন কিছু মুখ, এমন কিছু জীবনের প্রতিচ্ছবি যা প্রকাশ করে আমরা গর্বিত!

ভাল বই পড়ানো প্রকাশকদের নৈতিক দায়িত্ব, যা পালন করে যাবই, এই জেদ আমাদের অহঙ্কার—

ভূমিকা

আদালত এবং আদালতের ঘটনা নিয়ে ইতিপূর্বে একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। সে সব প্রকাশনা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। মানুষের জীবনের ভাঙা গড়া হাসি কান্নার অনেক কাহিনী মুখর হয়ে হাজির হয়েছে পাঠকের কাছে। চিত্রগুপ্ত রচিত আলোচ্য বইখানি 'বরণীয় যাঁরা আদালতে' বক্তব্যে অভিনব এবং উপস্থাপনায় অনবদ্য। এ কাহিনীতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা স্বনামধন্য। কোন না কোন কারণে তাঁরা এসে পড়েছেন আদালতের আঙিনায় অথবা আদালতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁদের নাম। কিছু বিখ্যাত বিচারের বিবরণ ও তার পশ্চাৎপট অজানাকে জানা অচেনাকে চেনার সুযোগ এনে দিয়েছে।

আজকের এই মহাধর্মাধিকরণে আদালতের এই সুদীর্ঘ কালের সংরক্ষিত নথিপত্র অমূল্য রত্ন-সম্ভার। সেই রত্ন চয়ন করতে লেখক বিচরণ করেছেন আজকের হাইকোর্টের সীমানা ছাড়িয়ে শতাব্দী পেরিয়ে সে যুগের সুপ্রীম কোর্টে, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতে। বহু অজানা তথ্য এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা তিনি উপহার দিয়েছেন। তিনি নতুন করে চিনিয়েছেন করুণাসাগর বিদ্যাসাগরকে যেখানে দেখা গেছে বিচারকের ভূমিকায় সেই জ্ঞান-তপস্বীকে। শহীদ ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ নতুন আলোকপাত করেছেন তিনি যা এতদিন ছিল মহাফেজখানার অন্ধ গহ্বরে। জীবনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কবি মধুসূদন থেকে ব্যারিস্টার মাইকেল এবং

কবি জীবনের একটি সকরুণ অধ্যায়, ব্যবসায়ীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের শেষ ইচ্ছা এ বইতে সন্নিবেশিত হয়েছে। লোকমাতা রাসমণি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে জামাতাকে আদালতে টেনে এনেছিলেন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বীর বিক্রমে রুখেছিলেন মানহানির মামলা, ভাওয়াল রাজকুমারের জীবনের প্রকাশ্য ও নেপথ্য ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে শুনিয়েছেন লেখক বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে। গিরিশ ঘোষের জীবনের অজানা অধ্যায়, হাইকোর্ট দায়রা বিচারের আসামী উল্লাসকর দত্ত, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দেউলিয়া হওয়ার কথা, প্রেস আইনে সজনীকান্ত দাসের শাস্তিভোগ, বিধানচন্দ্র রায়ের শেষ ইচ্ছা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদারতা, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইল এবং রাসবিহারী ঘোষের ঐতিহাসিক দানপত্র যা কালের নীরব সাক্ষী হয়ে জমা আছে আদালতের দপ্তরে, লেখক তাঁর সুনিপুণ বর্ণনায় সে সব উপস্থিত করেছেন এই গ্রন্থে যা এইসব খ্যাতিধন্য লোকের প্রকাশিত জীবনীতে হয়ত এতদিন অনুক্ত থেকে গেছে।

তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে রেভারেণ্ড জেম্স লং-এর রাজদ্রোহিতার বিচার, ১৮৫০ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকা এবং উইলিয়ম টেলর ও ইংলিশম্যান দৈনিক পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা পড়ে মনে হয় যেন সেই যুগেই বসে এই সব বিচার প্রত্যক্ষ করছি। চোখের সামনে তাঁদের জীবন্ত মুখগুলো ভেসে ওঠে। আবার দেখি মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতের পরোয়ানায় গ্রেপ্তার বরণ করে বিচারকের সামনে হাজির। তাঁকে জবাব দিতে হবে অনাদায়ী টাকার জন্যে কেন তাঁকে জেলে পাঠানো হবে না। এই মর্মস্পর্শী ঘটনা অনেকেরই অজানা।

'বরণীয় যাঁরা আদালতে' বাংলা সাহিত্যে এক বলিষ্ঠ সংযোজন। লেখকের পুরানো নথিপত্রের সযত্ন সন্ধান আবিষ্কারের পর্যায়ে পড়ে। এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলোর ভেতর থেকে আমরা যেমন জানতে পেরেছি বেশ কিছু কৃতী পুরুষের জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়, তেমনি সে কালের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জগতের কিছু চিত্রও খুঁজে পেয়েছি। সুললিত সাবলীল ভাষা বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

পরিশেষে বলি, কাহিনীগুলো কালানুক্রমে ধারাবাহিক সাজালে বোধ হয় আরও ভাল হত। প্রতিটি কাহিনী স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে লেখক হয়ত সে কথা ভাবেন নি। আমি বইখানির বহুল প্রচার আশা করি।

প্রস্তাবনা

কলকাতা হাইকোর্ট 'কোর্ট অফ রেকর্ডস'। ধর্মাধিকরণের চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী হয়ে আছে শতাধিক বছরের একটি চলমান কাল। এখানকার অমূল্য নথিপত্রের সম্ভার কালের অতন্দ্র প্রহরী। কালের নীরব সাক্ষী। এখানে খুঁজে পাওয়া যায় সে কালের কলকাতার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিন্নতর ছবি অন্যতর ইতিহাস। সে ইতিহাস গবেষণার অপেক্ষা রাখে। দৃষ্টির দর্পণে জীর্ণ নথিপত্র বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আদালতের অঙ্গণে কিছু বরণীয় মানুষের জীবনের স্মরণযোগ্য অধ্যায় এই গ্রন্থের উপজীব্য। আমার সুদীর্ঘ দিনের গবেষণার এই ফসল যদি উৎসাহী পাঠক ও সন্ধায়ী গবেষককে তৃপ্ত করতে পারে তবেই জানব আমার শ্রম সার্থক।

এই লেখকের অন্য বই :

জীবন বিচিত্রা ॥ আমি চঞ্চল হে ॥ এরা অভিযুক্ত আসামী

চেনা মুখের মিছিল ॥ যদিদং হৃদয়ং মম ॥

In the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION.

Robindronath Tagore vs Sheik Rohomunnaum

We Robindronath Tagore, Surendranath Tagore, Bolendronath Tagore and Romoni Mohun Chatterjee — the Plaintiffs abovenamed put in our place and stead BABU MOHINI MOHAN CHATTERJI, Attorney-at-law, to conduct the above suit and [illegible] for ourselves and for our heirs, executors, administrators, and representatives, undertake and promise to pay to the said BABU MOHINI MOHAN CHATTERJI, his heirs, executors, administrators, representatives, and assigns, all and every the fees to Counsel and such other costs, charges, and expenses as he may be entitled to in and about the same. Dated this 14th day of December 1896.

Witness

Robindranath Tagore
Surendranath Tagore
Balendranath Tagore
Ramanimohun Chatterjee

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বনাম শেখ রহম আলির মোকদ্দমায় রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষর-সংবলিত মূল দলিলের প্রতিলিপি।

—বারোশো বাহান্ন টাকা।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, এখন উপায়?

সারদাচরণ বললেন, কোন উপায় নেই। ও টাকা সহজে আদায় হবে না। একমাত্র উপায় ওদের নামে নালিশ করা।

কিন্তু মামলায় রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজী হতে পারলেন না। সারদাচরণকে তিনি অন্য উপায় দেখতে বললেন। সুরেন্দ্রনাথ এলেন। বলেন্দ্রনাথ ও রমণীমোহন এলেন। ওঁদের সঙ্গে অনাদায়ী টাকা নিয়ে আলোচনা চলল।

This is the last Will and Testament of me, BIDHAN CHANDRA ROY residing at No.36, Nirmal Chunder Street -- (formerly No.36, Wellington Street), Calcutta.

I do hereby revoke all my previous Wills and Codicils, if any, and declare this to be my last Will and Testament.

I appoint my nephew **Subimal Roy**, Barrister-at-Law, of No.34, Rowland Road, Bhowanipur, Calcutta to be the Executor and Trustee of this my last Will and Testament.

My Executor and Trustee shall pay my just debts and liabilities, if any, and costs of obtaining Probate of this my last Will and Testament.

আমাদের সবার প্রিয়তম পুরুষ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের শেষ ইচ্ছার দলিল থেকে একটা অংশ।

হাইকোর্টের নথিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর।

াণীরাসমণির শীলমোহর।

করুণাসাগর বি সাগরের 'বর্ণপরিচয়' নিলামের পশ্চাতপট

SIGNED by Dr. Sidhan Chandra Roy in our presence and we have at his request and in his presence have subscribed our respective signatures hereto as attesting witnesses:-

Bidhan Chandra Roy

N C Mitra
Attorney-at-Law

Sarojendra Nath Chakrabarty
37, Kali Temple Road
Calcutta-26

ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

Kali Prosanna Singha

হাইকোর্টের নথিপত্র থেকে সযত্নে তুলে আনা কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বাক্ষর।
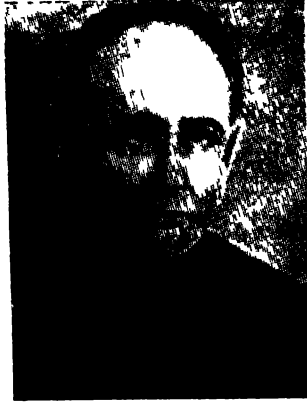
বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' নীলাম প্রসঙ্গে

করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের দেহাবসান হয় আঠারশো একানব্বই সালের উনত্রিশে জুলাই তারিখে। মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে আঠারশো পঁচাত্তর সালের একত্রিশে মে তারিখে তিনি তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার জন্যে একটি উইল করেন। তাঁর সই করা উইলখানি কলকাতার রেজিস্ট্রী অফিসে একটা সীলমোহর দেওয়া খামের মধ্যে রাখা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর অন্যতম একজিকিউটর একমাত্র ক্ষীরোদনাথ সিংহ হাইকোর্টে প্রোবেটের জন্যে আবেদন করলেন। অন্য একজিকিউটরদের মধ্যে রায়বাহাদুর কালীচরণ ঘোষ ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং বিনয় মাধব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকতেই মারা যান। যখন হাইকোর্টে প্রোবেটের দরখাস্ত করা হয় তখন বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বিয়াল্লিশ এবং তার ছেলে প্যারীমোহন নাবালক। নাবালক প্যারীমোহনকে দিয়ে নারায়ণ একজিকিউটরের নামে একটি মামলা করলেন তার বাবার উইলের বৈধতার প্রশ্ন নিয়ে। সেই মামলায় বিদ্যাসাগরের উইলটি নাকচ হয়ে যায় এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মতে সম্পত্তি নারায়ণের হাতে ফিরে আসে। আর সেই দিন থেকেই গোলমালের শুরু। হাতে সম্পত্তি পেয়ে নারায়ণ নিজ মূর্তি ধরলেন।

করুণাসিন্ধু তার উইলে যে সব অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন সে সবের ধারে কাছেও তিনি গেলেন না। কয়েকবছর পরে উনিশশো চার সালে সাহায্যের তালিকাভুক্ত নলিনীবালা দেবী ও আরও অনেকে নারায়ণের নামে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল। তাদের আবেদন বিদ্যাসাগরের উইল আবার বিবেচনা করা হোক এবং আয়ব্যয়ের হিসাব করা হোক। বিদ্যাসাগরের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওপর রিসিভার বসানো হোক। সেই মতো ব্যবস্থাও হল। হাইকোর্টের একজন অফিসার জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র রিসিভার নিযুক্ত হলেন। এতদিন যারা উইল অনুযায়ী মাসিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং এতদিনে যা দেনা হয়েছে সে সব শোধ করার ব্যবস্থা করার জন্যে আদালত রিসিভারকে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি বন্ধক রেখে তিরিশ হাজার টাকা ধার করার অনুমতি দিল। আর, সেইটাই হল সর্বনাশের শুরু। বরেণ্য শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্পত্তির ওপর চলল অবাধ ব্যবচ্ছেদ। এই ভাবে চলতে চলতে উনিশশো এগার সালে জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্রের জায়গায় নতুন রিসিভার এলেন ব্যারিস্টার প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী। আদালতের আদেশ নিয়ে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি বাঁচাতে তিনি টাকা ধার করতে লাগলেন আর সেই ব্যাপারে তাকে মদত দিতে লাগলেন নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একের পর এক মামলা শুরু হল। তখনকার মামলা মোকর্দ্দমাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই দুজনের যোগ সাজসে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি তছনছ হয়ে গিয়েছিল। আর এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' ও আরও কয়েকখানি বই হাইকোর্ট থেকে নীলাম হয়ে যায়। সমস্ত ঘটনাটাই যেন একটা সাজানো মামলা। বিনা প্রতিবাদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। সেই মামলা থেকে জানা যায় উনিশশো তের সালে উনচল্লিশের দুই শিবনারায়ণ দাসের গলির সিদ্ধেশ্বর পানের স্ত্রী মাখনবালা দাসীর কাছে রিসিভার প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী একটি বাংলা মর্টগেজ দলিলে সই করে তিন হাজার টাকা ধার করেন। টাকার নিরাপত্তার জন্যে সেই দলিলে বিদ্যাসাগরের লেখা কয়েকখানি বইএর

স্বত্ব দায়াবদ্ধ থাকে। সেই বইগুলো হল 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয়-ভাগ, 'বোধোদয়', 'কথামালা,' 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ 'উপক্রমণিকা'। কথা ছিল শতকরা বার্ষিক বারো টাকা হারে সুদ সমেত এক বছরের মধ্যে রিসিভার টাকা শোধ করে দেবেন। চার বছরেও সুদ বা আসল কিছুই না পেয়ে মাখনবালা আদালতের দ্বারস্থ হল। রিসিভার প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরীর নামে সমন জারি হল। নিজে সমন সই করে নিয়েও প্রভাত কুসুম কোর্টে হাজির হলেন না। বিদ্যাসাগর-তনয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সব জেনে শুনে চুপ করে রইলেন। ফলে মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্যে গেল বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর এজলাসে এবং উনিশশো সতের সালের ডিসেম্বরের তিন তারিখে ডিক্রী হয়ে গেল। সুদে আসলে মাখনবালার পাওনা টাকার হিসাব করার ভার দেওয়া হল হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের ওপর। উনিশশো আঠার সালের এপ্রিল মাসে রেজিস্ট্রার তার রিপোর্ট পেশ করলেন। তখন সুদ সমেত মোট পাওনার পরিমাণ পাঁচ হাজার চারশো দশ টাকা ছ' আনা পাঁচ পাই। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে উনিশশো উনিশ সালের বারোই ফেব্রুয়ারী তারিখে আবার মামলা উঠল বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর কাছে। সেবারেও রিসিভার বা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনের কেউ হাজির হলেন না। তার ফলে বন্ধক রাখা সব বইগুলি নীলামে বিক্রী করার আদেশ হল। যথাবিধি তৈরি হল বিক্রীর নোটিশ ও বিক্রীর শর্তাবলী। উনিশশো উনিশ সালের আটাশে জুন তারিখে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের নীলাম কামরায় বেলা বারোটায় নীলামের ডাক হল। সবচেয়ে বেশি দর দিলেন বাইশের পাঁচ ঝামাপুকুর লেনের আশুতোষ দেব। উনিশ হাজার দুশো টাকায় 'বর্ণপরিচয়' সমেত বিদ্যাসাগরের আরও কয়েকখানা বই তিনি নীলামে কিনে নিলেন। মাখনবালা তার পাওনা টাকা ফেরৎ পেল। উদ্বৃত্ত টাকাটা তখনকার মত রইল রিসিভারের জিম্মায়।

বিচারক বিদ্যাসাগর

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের একজন নামকরা লোক ছিলেন। আঠারশো সত্তর সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার আগে তিনি কোন উইল করে যেতে পারেন নি। ডাক্তার দুর্গাচরণ স্ত্রী জগদম্বা, একমাত্র মেয়ে, এবং পাঁচ ছেলে রেখে গিয়েছিলেন। পাঁচ ছেলের নাম দেবেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্র-নাথ, মহেন্দ্রনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ। বাবার মৃত্যুর সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ছাত্ররূপে ইংলণ্ডে ছিলেন। দুর্গাচরণ মারা যাওয়ার পর বিলেতে ছাত্রাবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ খুব অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। জগদম্বা দেবী নিজের জমানো টাকা থেকে দু'হাজার একশো উনষাট টাকা কয়েক কিস্তিতে পাঠিয়েছিলেন। সেই টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরও টাকার দরকার হয়ে পড়ে। বিদেশে ছেলের এই অবস্থার কথা জেনে জগদম্বা দেবী নিজের ও একমাত্র মেয়ের গয়না বাঁধা রেখে আবার পাঠালেন হাজারেরও কিছু বেশি টাকা। দুঃখের কথা, সময় মতো গয়নাগুলো উদ্ধার করতে না পারার জন্যে বিক্রী হয়ে যায়। জগদম্বা দেবী সত্যিই ছিলেন আদর্শ জননী। এই মহীয়সী মহিলা ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্যে এতখানি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার না করলে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন কতখানি সফল হত সে কথা বলা শক্ত।

ডাক্তার দুর্গাচরণের মৃত্যুর পর একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরে। মহেন্দ্রনাথ দেনার দায়ে বসত বাড়ির নিজের অংশ অন্যান্য ভাইদের কাছে বিক্রী করে দেন। আঠারশো আটাত্তর সালে সুরেন্দ্রনাথ আলাদা হয়ে যান। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জগদম্বা দেবীর সঙ্গে ছেলেদের বিরোধ বাধে। শেষে নিরুপায় হয়ে আঠারশো তিরাশি সালে জগদম্বা দেবী বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগির জন্যে হাইকোর্টে নালিশ করলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। বাদী বিবাদীরা সকলে একমত হয়ে তাদের পারিবারিক বিরোধের মীমাংসার জন্যে বিদ্যাসাগর মশায়ের

দ্বারস্থ হলেন। সানন্দে রাজি হলেন বিদ্যাসাগর। তাঁকে আরবিট্রেটর নিযুক্ত করা হল। বিদ্যাসাগর ওদের পারিবারিক হিসাব পরীক্ষা করে দেখলেন। দুর্গাচরণের সমস্ত সম্পত্তির দর দামও নির্ধারণ করা হল। সমস্ত খতিয়ে দেখে বিদ্যাসাগর সকলের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের সুচিন্তিত অভিমত দিলেন এবং সেটি হাইকোর্টে দাখিল হল। আঠারশো পঁচাশি সালের মার্চের ন' তারিখে হাইকোর্টের বিচারপতি জন ফ্রীম্যান নরিস বিদ্যাসাগরের অ্যাওয়ার্ড বহাল করে এই মামলার নিষ্পত্তি করেন। মায়ের কাছে সুরেন্দ্রনাথের ঋণের জন্যে আদালত আদেশ দিল যতদিন জগদম্বা দেবী বেঁচে থাকবেন ততদিন সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে দেবেন। এই আপোষ মীমাংসা যখন হয়েছিল তখন দুর্গাচরণের ছোট ছেলে জিতেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে বিলেতে ছিলেন। তিনি ফিরে এসে নতুন করে মামলা শুরু করলেন। সে আর এক কাহিনী।

বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনে প্রচুর অর্থ উপায় করেছিলেন। সরল অনাড়ম্বর এই প্রবাদ পুরুষ উপার্জনের বেশির ভাগই দান করেছিলেন দীন দরিদ্র মানুষের দুঃখ দূর করতে। শেষ জীবনে তিনি যে উইল করেছিলেন তা একটি ঐতিহাসিক দানপত্র। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা মামলা চক্রে সেই উইলের সমাধি হয়েছিল। তবু বিদ্যাসাগরকে সম্পূর্ণরূপে জানতে গেলে তাঁর শেষ ইচ্ছার কথাও জানা দরকার। উইলে তিনি তিনজন একজিকিউটর নিযুক্ত করেছিলেন। তারা হলেন চৌগাছার কালীচরণ ঘোষ, পাথরার ক্ষীরোদ নাথ সিংহ ও তাঁর ভাগ্নে বিনয় মাধব মুখোপাধ্যায়। তাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা তাঁর কাছে সাহায্য পেয়ে আসছে, তাঁর মৃত্যুর পরেও সম্পত্তির আয় থেকে তাদের সেই সাহায্য যেন যথারীতি চালিয়ে যাওয়া হয়। মৃত্যুর সময়ে তাঁর যদি কিছু দেনা থাকে তাও যেন দিতে কোনরকম গাফিলাতি না হয়। তাঁর আশ্রিতরা হয়ত আগের মত উপকৃত হবে

না। তবুও তিনি সকলের কথা ভেবে একটা দীর্ঘ তালিকা তৈরী করেছিলেন। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাবেন মাসে পঞ্চাশ টাকা, মেজভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন চল্লিশ টাকা, ছোট ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশ টাকা। বড় বোন মনমোহিনী দেবীর জন্যে তিনি মাসে বরাদ্দ করেছিলেন দশ টাকা, মেজ দিগম্বরীর দশ ও ছোট মন্দাকিনীর জন্যে দশ। স্ত্রী দীনময়ী দেবী পাবেন মাসে তিরিশ টাকা। মেয়েদের কথাও তিনি ভোলেন নি। বড় মেয়ে হেমলতা পনের, মেজ কুমুদিনী পনের, সেজ বিনোদিনী পনের এবং ছোট শরৎকুমারী পনের। মাসিক অনুদানের ব্যাপারের তালিকায় আরও কুড়ি জনের নাম ছিল। তারা সকলেই তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। মাসিক দুটাকা থেকে পনের টাকা তিনি তাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে-ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের কোন সন্তানের ভরণ-পোষণ বা পড়াশুনার অসুবিধা হলে তাকে মাসিক পনের টাকা যেন সাহায্য দেওয়া হয়। এ ছাড়া দয়ার সাগর তাঁর উইলে একজন নীলমাধব ভট্টাচার্যের বিধবা স্ত্রীর জন্যে মাসিক তিরিশ এবং তিন সন্তানের জন্যে মাসিক দশ টাকার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সন্তানেরা যতদিন না সাবালক হয় শুধু ততদিনই এই সাহায্য চলবে। নীল-মাধবের স্ত্রী সারদা যদি আবার বিয়ে করে বা কোনরকম অসামাজিক জীবনে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার সাহায্য বন্ধ হবে।

সমাজ ও চারপাশের মানুষের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের আন্তরিক চিন্তা ও গভীর মমত্ববোধ তাঁর উইলের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। মাইকেল শ্রদ্ধা নিবেদনে তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'করুণার সিন্ধু তুমি সে-ই জানে মনে, দীন যে দীনের বন্ধু।' সত্যিই ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধু। বৈরাগ্যের ভস্ম মেখে তিনি আমরণ দীনের সেবা করে গেছেন। অন্যান্য সাহায্য সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যালয় মাসে একশো টাকা অনুদান পাবে। গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয় পাবে পঞ্চাশ টাকা। গ্রামের অভাবগ্রস্ত লোকজনের জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন মাসে তিরিশ টাকা। এ ছাড়া তিনি বলেছিলেন, বিধবা বিবাহের জন্য প্রতি ক্ষেত্রে একশো টাকা খরচ করা যেতে পারে।

শেষ জীবনে যারা বিদ্যাসাগরকে দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের নাম জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ পালিত ও গোবিন্দ চন্দ্র ভড়। তাদের সেবা ও যত্নে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাদের প্রত্যেককে তিনি তিনশো টাকা করে দিতে বলেছিলেন। একজিকিউটরদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সম্পত্তি রাখতে এবং সামাজিক নিয়ম কানুন মানতে তাঁরা যেমন ভাল বুঝবেন তেমন করবেন। যদি ভবিষ্যতে তাঁর আয় কমে যায় এবং নির্দেশ অনুযায়ী সাহায্য দান সম্ভব না হয় তাহলে একজিকিউটররা নিজেদের বিবেচনা মতো সাহায্যের পরিমাণ কমাতে পারবেন।

নিজের লেখা বই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে বলেছিলেন, তাঁর লেখা সব বই 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী' নামে প্রকাশকের মাধ্যমে বিক্রী হয়। তাঁর ইচ্ছা যতদিন পর্যন্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ওই সংস্থার মালিক থাকবেন, ততদিন তাঁর বই বিক্রীর ভার ব্রজনাথেরই থাকবে। যদি কোন কারণে ব্রজনাথবাবুর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে একজিকিউটররা বই বিক্রীর অন্য ব্যবস্থা করবেন।

বজ্রকঠোর ত্যাগী পুরুষ বিদ্যাসাগর জীবনের সায়াহ্নে পৌছে প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলেন। আজীবন যিনি পরের ছেলেকে আপন করে নিয়েছিলেন, সেই লোকের নিজের ছেলে পর হয়ে গিয়েছিল। শেষ বয়সে একমাত্র ছেলে নারায়ণের জন্যে তাঁর মনোবেদনার শেষ ছিল না। তবুও কর্তব্যের অবিচল নিষ্ঠায় তিনি স্নেহের দৌর্বল্যকে জয় করে-ছিলেন। উইলে তিনি লিখেছিলেন, আমার ছেলে বলে পরিচিত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা অসৎ অভ্যাসে লিপ্ত ও নানা দোষে দুষ্ট। সেই কারণে এবং আরও গভীরভাবে চিন্তা করে আমি তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। সেই জন্যে মাসিক সাহায্যের যে তালিকা দিয়েছি তা থেকে নারায়ণের নাম বাদ গেছে। সে কোনক্রমেই আমার উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হবে না।

বিদ্যাসাগরের সই করা উইলখানি কলকাতার রেজিস্ট্রি অফিসে সীলমোহর দেওয়া খামের মধ্যে রাখা ছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে অন্যতম একজিকিউটর ক্ষীরোদ নাথ সিংহ কলকাতা হাইকোর্টে

প্রোবেটের জন্যে আবেদন করলেন। রায় বাহাদুর কালীচরণ ঘোষ একজিকিউটরের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। বিনয়মাধব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকতেই দেহ রাখেন। প্রোবেটের দরখাস্তে বিদ্যাসাগরের পূর্ণ বংশ পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। তাঁর একমাত্র ছেলে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন বিয়াল্লিশ। নারায়ণের একমাত্র ছেলে প্যারীমোহন নাবালক। বিদ্যাসাগরের চার মেয়ের ন'টি ছেলে। হেমলতার দুই ছেলে সুরেশচন্দ্র ও জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি। কুমুদিনীর তিন ছেলে যোগেন্দ্র, নগেন্দ্র ও উপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিনোদিনীর দুই ছেলে গোবিন্দলাল অধিকারী ও অপরটি নবজাত। শরৎকুমারীর দুই ছেলে হরিমোহন ও রামকমল চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগরের উইলের সাক্ষী ছিলেন তখনকার ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিসন স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর কালীচরণ ঘোষ, কলকাতার ইন্‌সপেক্টর অফ স্কুল রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকীল যোগেশচন্দ্র দে এইং পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বাকি চারজন সাক্ষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, নীল মাধব সেন ও বিহারীলাল ভাদুড়ী প্রোবেটের দরখাস্ত দাখিল হওয়ার আগেই মারা যান।

প্রোবেটের দরখাস্তের শুনানীর সময়ে বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ আদালতে হাজির হয়ে বললেন, একমাত্র ছেলে হিসেবে আমিই প্রকৃত-পক্ষে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। নাবালক প্যারীমোহনকে দিয়ে তিনি একজিকিউটরের নামে একটা পাল্টা মামলাও জুড়ে দিলেন। উইলে সাক্ষী হিসাবে যাঁরা সই করেছিলেন তাদের মতামত জানার জন্যে আদালতকে তিনি অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে বিদ্যাসাগরের উইল আদালতে এসে গিয়েছিল। যে সব সাক্ষীরা তখনও বেঁচে ছিলেন তারা সকলেই এফিডেভিট দাখিল করলেন। আশ্চর্যের কথা সকলেই প্রকারান্তরে নারায়ণকে সমর্থন করলেন। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বক্তব্য বিস্ময়কর। তিনি বললেন, বিদ্যাসাগর মশাই উইলে তাঁর সামনে সই করেছেন কিনা তিনি বলতে পারেন না। তিনি নিজে উইলের সাক্ষী হয়েছিলেন একথাও তাঁর মনে

পড়ে না। রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বললেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উইলে সাক্ষী হিসেবে সই করেছেন বলে তার আবছা মনে পড়ছে। তবে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সামনে উইলে সই করেছিলেন কিনা সে কথা তিনি শপথ করে বলতে পারেন না। কালীচরণ ঘোষও এই রকমের একটা হাস্যকর উক্তি করেছিলেন। তিনি বললেন, বিদ্যাসাগরের উইলের তলায় সাক্ষীর সইগুলোর মধ্যে একটি তাঁর স্বাক্ষর বলে মনে হচ্ছে। বিদ্যাসাগর তাঁকে একখানি কাগজে সই করতে বলায় তিনি সেই আদেশ পালন করেন। যদিও সই করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বিদ্যাসাগর উইলে তার সামনে সই করেছিলেন কিনা মনে নেই। এই সব উল্টোপাল্টা কথায় মামলা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠল। অবশেষে সব প্রশ্নের মীমাংসা হল আঠারশো বিরানব্বই সালের আঠারই আগস্ট। বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হল না। তাঁর উইল সিদ্ধ বলে বিবেচিত হল না। বিচারপতি আর্নেস্ট জন ট্রেভলান হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মতে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পত্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে রায় দিলেন।

ক্ষুদিরাম যা বলেছিল

উনিশশো আট সালেব তিরিশে এপ্রিল। বাত্রি তখন সাড়ে আটটা। মজঃফরপুব শহবে জজসাহেব কিংসফোর্ডেব বাংলোব পথে একটা ল্যাণ্ডো গাড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে ফিবছিল। প্রচণ্ড শব্দে বোমাব আঘাতে ভেঙে পড়ল গাড়িটি। আবোহী ছিল মিসেস ও মিস কেনেডি ঘটনার এক ঘণ্টা পবে মিস কেনেডি মাবা গেল। মিসেস কেনেডিব জীবন দীপও নিভে গেল ছত্রিশ ঘণ্টা মৃত্যুব সঙ্গে লড়াই কবে।

পরের দিন সকালে ঘটনাস্থল থেকে ছাব্বিশ মাইল দূবে ওয়াইনি স্টেশনেব কাছে ধবা পড়ল ক্ষুদিবাম। উনিশ বছরের যুবক ক্ষুদিবামকে হাজিব কবা হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এইচ সি. উডম্যানেব কাছে।

ক্ষুদিবামের কাছে পব পব দুটি জবানবন্দী নেওয়া হয। উডম্যানেব কাছে স্বীকারোক্তি ছাড়াও অপব এক ম্যাজিস্ট্রেট ই ডব্লিউ বার্থউডেব কাছে ক্ষুদিরাম জবানবন্দী দিযেছিল। দুটি ক্ষেত্রেই ক্ষুদিবামেব স্বাক্ষব নেওয়া হয় যে স্বেচ্ছায সে এই সব স্বীকাবোক্তি কবেছিল। কিন্তু আজ প্রশ্ন জাগে সত্যিই সে সব কথা সে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিল অথবা পুলিশের প্রচণ্ড অত্যাচাবে বলতে বাধ্য হয়েছিল। সে সব প্রশ্নের মীমাংসা আজ সম্ভব নয়। ফাঁসিব মঞ্চে ক্ষুদিরাম জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। সমসাময়িক অন্য কেউও হয়ত আজ বেঁচে

নেই। কিন্তু আদালতের আঙিনায় ক্ষুদিরামের বলা কথা বলে যা লেখা আছে তা থাকবে যতদিন কালের গর্ভে তা বিলীন হয়ে না যায়। তার সত্যতা যাচাই করার কোন উপায়ই আজ নেই। সেই তুটি জবানবন্দীই আজ তুলে ধরছি পাঠকের কাছে।

আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। আমার বাবার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু। আমি জাতিতে কায়স্থ এবং পেশায় ছাত্র। নিবাস মেদিনীপুর। আমি পাঁচ ছ' দিন আগে কলকাতা থেকে এখানে এসেছিলাম কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে। স্টেশনের কাছে ধর্মশালায় আমি উঠেছিলাম। আমার সঙ্গে আর একটি ছেলে এসেছিল। সে তার নাম বলেছিল দীনেশ চন্দ্র রায়। নিবাস বাঁকিপুর। তার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে আমার প্রথম দেখা হয়। আমরা একই সঙ্গে এখানে এসেছিলাম একই উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কাজে নেমেছিলাম। পত্র পত্রিকায় প্রচারিত সংবাদ আমাকে এই কাজের প্রেরণা দিয়েছিল। এই সকল পত্র পত্রিকার নাম সন্ধ্যা, হিতবাদী, যুগান্তর এবং অন্যান্য। এই সব পত্রিকায় বিদেশী সরকারের জুলুমের কথা প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য কিংসফোর্ডের নাম বিশেষভাবে বর্ণিত না হলেও আমি তাকে হত্যা করার সংকল্প নিয়েছিলাম এই কারণে যে সে বহু লোকের কারাবাসের জন্য দায়ী। আমি এবং দীনেশ অকস্মাৎ রেলগাড়িতে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই এবং বাক্য বিনিময় করি। আমাদের কথাবার্তার মাঝে সে আমাকে তার উদ্দেশ্য বলেছিল এবং আমিও বলেছিলাম আমার। রেলগাড়িতে আরও অনেক যাত্রী ছিল কিন্তু আমরা কারও সঙ্গে কথা বলিনি।

এখানে ধর্মশালায় আশ্রয় নেওয়ার পর আমরা চার পাঁচদিন সেখানে কাটালাম এবং কিংসফোর্ডকে খুন করার বিষয়ে পরামর্শ চালালাম। তুই বা তিন দিন পর আমরা তার বাড়ির সামনে ঘোরা-ফেরা করি। কখন সে বাড়ির বাইরে বের হয় এবং সন্ধ্যায় কখন ফেরে আমরা তা লক্ষ্য করতে থাকি। দিনের বেলায় কাছারিতে গিয়ে আমরা তার চেহারাটা ভাল করে দেখে আসি।

আমার অভিপ্রায় ছিল রিভলবারের গুলিতে কিংসফোর্ডকে হত্যা

করা। আমার কাছে দুটি রিভলবার ছিল। দীনেশের কাছে একটি রিভলবার ও বোমা ছিল। কলকাতা থেকে দীনেশ বোমা এনেছিল। আমাকে বলেছিল, সে বোমা তৈরি করতে জানে। টিনের আবরণ দিয়ে বোমাগুলি তৈরী। ব্যাসার্দ্ধ তিন চার ইঞ্চি।

ধর্মশালায় রাখা আমাদের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে বোমাগুলি রেখেছিলাম। দু'তিনদিন আমরা জজসাহেবের বাড়ির কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু কোন সুযোগ পাইনি।

গতরাত্রে আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি ও দীনেশ মাঠের মাঝে অপেক্ষা করছিলাম। আমি দেখলাম গাড়িটি ক্লাব থেকে ফিরছে। নিশ্চিত সেটি কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে আমি বোমা নিক্ষেপ করলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়েছিল। আমি কেবল একটিমাত্র বোমা নিক্ষেপ করেছিলাম। গাড়িটির খুব কাছাকাছি ছুটে গিয়ে বোমাটি ছুঁড়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল বিচারপতি কিংসফোর্ড নিশ্চয়ই সেই গাড়িতে আছে। তখন অন্ধকার রাত্রি। সে সময়ে আমার গায়ে একটি ডোরাকাটা কোট ছিল। দীনেশের গায়ে একটি সাদা সিল্কের জামা ছিল। গাছতলায় এসে সে জামাটি আমার কাছে খুলে দেয়। কারণ, জামা পরা অবস্থায় সে অসুবিধা বোধ করছিল। তার গায়ে তখন গেঞ্জি ও একটি চাদর ছিল। আমাদের দুজনের পায়েই জুতো ছিল কিন্তু বোমাটি ছোঁড়ার আগে আমরা গাছ-তলায় আমাদের জুতো রেখে দিয়েছিলাম। আমি সজোরে বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলাম। জানিনা দীনেশ আমাকে অনুসরণ করেছিল কি না। দীনেশের হাতে রিভলবার ছিল। সে গুলি ছুড়েছিল কিনা তা আমি জানিনা। বোমা নিক্ষেপের সময়ে আমার দেহে কোন আঘাত লাগেনি। কাজ সমাধা করে ক্ষিপ্রগতিতে আমরা ধর্মশালায় গিয়েছিলাম এবং তারপর আমরা উভয়ে পৃথক রাস্তা ধরেছিলাম। আমি রেললাইন ধরে অগ্রসর হয়ে সমস্তিপুর রোড ধরে চলতে থাকি। দীনেশ ধর্মশালা থেকে অন্য পথ ধরে।

বোমা নিক্ষেপ করার পর আমরা যখন ধর্মশালার দিকে ছুটে যাই তখন আমরা একজন কনস্টেবলের চীৎকার শুনতে পাই। আমরা সে

চীৎকারে কোন কর্ণপাত করিনি। যে রাত্রে আমরা বোমা নিক্ষেপ করেছিলাম, সেই রাত্রে ঘটনার কিছু আগে জজসাহেবের বাড়ির সামনে দু'জন লোক আমাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি বলেছিলাম, আমরা কিশোরীবাবুর .কাছে থাকি। আমরা জানতাম তিনি ধর্মশালার ম্যানেজার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় ছিল না। সেই দু'জন লোক আমাদের বলেছিল, এ পথে সাহেব আসবেন, তোমরা চলে যাও। আমি বলেছিলাম, আমি একটি ছেলের জন্য অপেক্ষা করছি। তার দেখা পেলেই চলে যাব।

অতঃপর আমরা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হই। কিছুদূর গিয়ে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কিংসফোর্ডের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। যখন সেই অজ্ঞাতনামা লোকদুটি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল তখন আমার বাঁ হাতে বোমাটি ধরা ছিল। আমি হাতটি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

যদিও বোমাটি ছিল দীনেশের, তবু আমিই সেটি নিক্ষেপ করেছিলাম। কারণ, কিংসফোর্ডকে খুন করার ব্যাপারে আমার ইচ্ছা ছিল প্রবলতর।

যখন আমরা পালিয়ে যাই, তখন ধর্মশালায় আমি একখানি ধুতি ফেলে গিয়েছিলাম। আমি জানিনা দীনেশ সেখানে কিছু ফেলে গিয়েছিল কিনা।

দীনেশের বয়স প্রায় আমারই সমান। তার মুখখানা গোল এবং দেহ আমার চেয়েও সুগঠিত। উচ্চতায় সে প্রায় আমারই সমান। তার ভ্রূ দুটি জোড়া ছিল না। মাথার চুল আমারই মতো কোঁকড়ানো এবং ঘন কালো। সে বলেছিল, তার এক দাদা বাঁকিপুরে রেল কোম্পানীতে কাজ করে।

নিয়মিত সংবাদপত্র পড়া ছাড়া আমি বিপিন পাল, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ এবং আরও বহুলোকের ভাষণ শুনেছি। তাঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিডন স্কোয়ার এবং কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এই সব ভাষণ আমাকে শক্তি দিয়েছে। এ ছাড়া বিডন স্কোয়ারে আরও একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সন্ন্যাসীর

ভাষণ আমি শুনেছি।

কলকাতায় আমি আমার এক মামার কাছে থাকতাম। মামার নাম সতীশ চন্দ্র দত্ত। চার অথবা পাঁচ নম্বর কর্পোরেশন স্ট্রীটে তিনি থাকেন। তিনি পেশায় স্কুল শিক্ষক। স্কুলটি কর্পোরেশন স্ট্রীটেই অবস্থিত।

ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরামের কাছ থেকে তেইশটি ছোট এবং চোদ্দটি বড় কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। সেই সম্পর্কে সে বলে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ও বউবাজারে সে ওইগুলি কিনেছিল। তার কোন বৈধ লাইসেন্স ছিল না। ক্ষুদিরাম বলে, অমূল্যরতন দাস নামে একটি ছেলে আমাকে এই দুটি রিভলবার দেয়। আমি একটির জন্য পঁচানব্বই টাকা ও অপরটির জন্য পনের টাকা দাম দিয়েছিলাম।

নিজের হাতঘড়িটি সনাক্ত করে ক্ষুদিরাম বলে এই হাতঘড়িটি আমার। রেলওয়ে টাইম টেবলটিও আমার। মোমবাতি ও দিয়াশলাই আমার কাছেই ছিল। গ্রেপ্তারের সময়ে পুলিশ আমার কাছ থেকে একত্রিশ টাকা সাত আনা তিন পাই পেয়েছে।

একটি টিনের বাক্স ক্ষুদিরামকে দেখানো হলে সে বলে, কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় সেই বাক্সের মধ্যে সে বোমা রেখেছিল। পুলিশের উদ্ধার করা একজোড়া জুতো সে তার নিজের বলে সনাক্ত করে এবং আর একজোড়া দীনেশের বলে সে চিহ্নিত করে। পুলিশের হেফাজতে একটা চাদর সে দীনেশের চাদর বলে সনাক্ত করে। চাদরটির এক অংশ ছেঁড়া ছিল। ক্ষুদিরাম বলে, সেই ছেঁড়া অংশটি বোমা জড়িয়ে নেওয়ার কাজে লাগান হয়েছিল।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেছিল, এক বছর আগে আমি মেদিনীপুর কলেজ ছেড়েছি।

মিস্টার উডম্যান তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি তোমার বিবৃতি স্বেচ্ছায় দিয়েছ?

উত্তরে ক্ষুদিরাম বলে, যা বলেছি, সব সত্য। আমার স্বীকারোক্তি আমি স্বেচ্ছায় বিবৃত করেছি।

এই স্বীকারোক্তিতে ক্ষুদিরাম বাংলা ভাষায় স্বাক্ষর দিয়েছিল।

তর্জমা করে তার বিবৃতিটি তাকে শোনানো হয়েছিল।

গ্রেপ্তার হওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে উনিশশো আট সালের তেইশে মে তারিখে মজঃফরপুরের একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ই, ডব্লিউ বার্থউডের কাছে দ্বিতীয়বার ক্ষুদিরামের জবানবন্দী নেওয়া হয়। পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম যা বলেছিল এই জবানীতে সে দীনেশ সম্বন্ধে তার বক্তব্য কিছুটা বদল করেছিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানস রঞ্জন সেন দোভাষীর কাজ করেছিলেন এবং সেই বিবৃতি ইংরাজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

প্রশ্ন—তুমি কি এই মাসের এক তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার উডম্যানের কাছে কোন বিবৃতি দিয়েছ?

উত্তর—হ্যাঁ।

—সেই স্বীকারোক্তি তোমার স্বেচ্ছাকৃত?

—হ্যাঁ।

—সে সময়ে তোমার ওপর কি কোন চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল?

—না।

দীনেশের একখানি ফটোগ্রাফ ক্ষুদিরামকে দেখানো হলে সেটিকে সে সনাক্ত করে। উদ্ধার করা দু'জোড়া জুতো তাকে দেখানো হয়। এক জোড়া নিজের ও অপর জোড়া দীনেশের বলে সে সনাক্ত করে।

—কখন এবং কোথায় তুমি জুতো জোড়া খুলেছিলে?

—বোমা ছোঁড়ার প্রায় দশ মিনিট আগে একটি গাছের তলায় আমি জুতো খুলেছিলাম।

একটি মানচিত্র দেখিয়ে ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, গাছটি কোথায়?

মানচিত্রে ক্ষুদিরাম গাছ ও গাছের নিচে জুতো রাখার স্থানটি চিহ্নিত করে।

একটি ব্যাগ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় সেটি তার কি না। উত্তরে সে বলে, হ্যাঁ।

—কোথায় তুমি এটি রেখেছিলে?

—ধর্মশালার পশ্চিম দিকের একটি ঘরে।

—ব্যাগটি কিজন্যে রেখেছিলে ?

—বোমা রাখার জন্য।

একটি খালি টিন দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এটি তুমি কোথায় রেখেছিলে ?

—মাঠের মাঝে।

—টিনটি কিজন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল ?

—বোমা রাখার জন্য।

একটি কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এটি কি-জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল ?

—বোমা জড়িয়ে রাখার জন্য।

—এ গুলি তুমি কোথায় পেয়েছিলে ?

—আমি সঠিক মনে করতে পারি না।

একটি চাদর দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেটি কার ?

—এটি দীনেশের চাদর।

দুটি রিভলবার দেখিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয় সে দুটি তাদের কি না। জবাবে সে স্বীকার করে তাদেরই সম্পত্তি।

—যখন তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন তোমার কাছ থেকে ব্যাগ, মোমবাতি ও দিয়াশলাই উদ্ধার করা হয়েছিল কি না ?

—হ্যাঁ।

একটি টাইম টেব্‌ল দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এটি কার ?

—আমার।

মিষ্টার উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম ইতিপুর্বে যা বিবৃতি দিয়েছিল সে সম্পর্কে সে বলে, রেলওয়ে স্টেশনে সে সেই সব কথা বলেছে।

—সেই বিবৃতি দেওয়ার সময়ে তোমার ওপর কোন জবরদস্তি হয়েছে ?

—না।

—তুমি কি জানতে মিষ্টার উডম্যান একজন ম্যাজিস্ট্রেট ?

—আমার সে রকম কোন ধারণা ছিল না।

একটি পিস্তল দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি

এটি সনাক্ত করতে অক্ষম। তবে দীনেশের এ রকম একটি ছিল।

—তুমি কি কনস্টেবল ফৈয়জুদ্দিন এবং তহশিলদার খানের বিবৃতি শুনেছ ?

—শুনেছি, তার কিছু অংশ সত্য।

—তাহলে সেই বিবৃতির মাঝে কিছু অসত্য উক্তি ছিল ?

—হ্যাঁ। তাদের মতো দুজন লোককে ঘটনাস্থলের কাছে একটি সেতুর ওপর বসে থাকতে দেখেছিলাম :

—তোমাকে ধরার ব্যাপারে কনস্টেবল শিউপ্রসাদ ও ফতে সিং এর বিবৃতি তুমি শুনেছ ?

—হ্যাঁ। কিন্তু বহুলাংশে তা মিথ্যা।

—কোন অংশটি মিথ্যা ?

—একজন কনস্টেবল আদালতে বলেছে আমার কাছ থেকে যে জামা তারা উদ্ধার করেছে তার পকেটে রিভলবার ছিল। কিন্তু তা মিথ্যা। জামা আমার গায়েই পরা ছিল।

—তুমি বলেছ মিষ্টার উডম্যানের কাছে যা স্বীকারোক্তি করেছ তার অনেকটাই দীনেশের দ্বারা আগে থেকে শেখানো ? সেটা কোন অংশ ?

—হাওড়া স্টেশনে দীনেশের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা মিথ্যা।

—তুমি কতদিন দীনেশকে জান ?

—কলকাতা ছাড়ার পাঁচ ছ' দিন আগে যুগান্তর অফিসে আমাদের দুজনের দেখা হয়।

—কি ভাবে তোমাদের পরিচয় হয়েছিল ?

—আমি মেদিনীপুরে যুগান্তর বিক্রী করতাম। কয়েকদিন কাগজ না পাওয়ায় আমি অফিসে গিয়েছিলাম।

—যুগান্তর অফিসে তোমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয় ?

—দু' তিনদিন যুগান্তর অফিসে যাওয়ার পর একদিন আমি সেখানে বসে দুপুরের আহার সমাধা করছিলাম। সেই সময়ে দীনেশ সেখানে আসে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি তাকে সব বলি। শুনে সে বলে আমার নাম তার

জানা। কারণ মেদিনীপুরে আমার বিরুদ্ধে একটা মামলা চলছিল। কিছু সময় আলাপের পর দীনেশ বলে তার জন্য কোন একটি কাজ করলে সে আমাকে পুরস্কৃত করবে। প্রথমে আমি রাজি হইনি কিন্তু পরে উৎসাহ বোধ করেছিলাম। পরের দিন শুক্রবার সে আমাকে বেলা তিনটার সময়ে হাওড়া স্টেশনে দেখা করতে বলে। সেই নির্ধারিত সময়ে সেখানে গেলে সে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। অনেক ইতস্তত করার পর আমি রাজি হয়েছিলাম এবং পরের দিন বিকাল পাঁচটায় সেখানে তার সঙ্গে দেখা করব বলে কথা দিয়েছিলাম।

—মিস্টার উডম্যানের কাছে তুমি যা বিবৃতি দিয়েছ তাতে দীনেশের শেখানো আর কি কথা ছিল?

—সে আমাকে বলেছিল কোথা থেকে রিভলবার পেয়েছি তা, যেন কারও কাছে প্রকাশ না করি।

—কোথা থেকে পেয়েছিলে?

—মজঃফরপুরে আসার পর সে আমাকে রিভলবার দেয় এবং বলে আমি সেটি অমূল্য রতন দাসের কাছে পেয়েছি। দীনেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করে কলকাতায় আমার কোন আত্মীয় আছে কিনা। প্রথমে আমি না বলি এবং তার পরে বলি আছে। দীনেশ আমাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করে।

—তুমি আগে যা বিবৃতি দিয়েছ তাতে দীনেশের আর কিছু প্ররোচনা ছিল কি?

—সে আমাকে বোমা ছুঁড়তে পরামর্শ দিয়েছিল।

—তোমার আর কিছু বলার আছে?

—না।

—তুমি কতদিন ধর্মশালায় ছিলে?

—ঘটনার দিন সমেত পাঁচ দিন।

—দীনেশ তোমার সঙ্গেই ছিল?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি কিশোরীমোহন ব্যানার্জীর সঙ্গে কোন কথাবার্তা

বলেছিলে ?

—না, আমি দীনেশের কাছে তার নাম শুনেছিলাম কিন্তু তার সঙ্গে কোন কথা হয়নি।

—তোমার আর কিছু বলার আছে ?

—না।

—তুমি কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এই বিবৃতি দিয়েছ ?

—হ্যাঁ, স্বাধীন ইচ্ছায় সত্য ঘটনা বলেছি।

—তুমি কি জান আমি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ?

—হ্যাঁ।

—পুলিশের পক্ষ থেকে তোমাকে কোন চাপ দেওয়া হয়েছে কি ?

—না।

ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি এখানেই শেষ। মজঃফরপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মানস রঞ্জন সেন ক্ষুদিরামকে বাংলা অনুবাদ করে বিবৃতিটি শোনান এবং তার স্বাক্ষর গ্রহণ করেন।
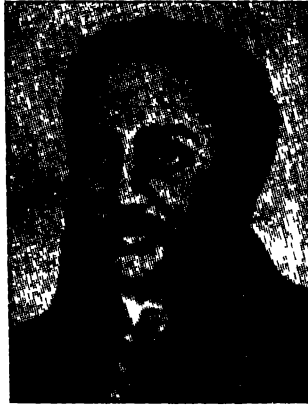
কবি মধুসূদন থেকে ব্যারিস্টার মাইকেল

মাইকেল মধুসূদনের আবাল্যের স্বপ্ন বিলেত যাবেন ব্যারিস্টার হবেন। সেই সংকল্পে তিনি অবিচল ছিলেন। অদৃষ্টকে পরিহাস করে আঠারশো বাষট্টি সালের জুন মাসের ন' তারিখে এস. এস. ক্যাণ্ডিয়া জাহাজে উঠে তিনি রওনা হলেন লণ্ডনের পথে।

বিলেতে মাইকেলের প্রবাস-জীবন বড় দুঃখের জীবন। অনাহারে অর্ধাহারে সেখানে তিনি দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। নিরুপায় হয়ে স্ত্রী হেনরিয়েটা কলকাতা ছেড়ে দুটি শিশুসন্তান নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁর কাছে। দীর্ঘ অদর্শন বেদনার পর তাঁর মনটা নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হয়েছিল। কিন্তু ভাবনা, বিদেশে তাদের চলবে কেমন করে। যাই হোক অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে মাইকেল লণ্ডনের গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে আঠারশো সাতষট্টি সালে দেশে ফিরে এলেন এবং স্পেন্সেস হোটেলে উঠলেন। ফেব্রুয়ারীর কুড়ি তারিখে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পিককের কাছে ব্যারিস্টার হিসাবে আদালতে যোগ দেওয়ার জন্যে আবেদন করলেন। মাইকেলের আবেদন বিবেচনার জন্যে সমস্ত বিচারপতিদের নিয়ে একটা বিশেষ অধিবেশন বসল। স্যার বার্নেস পিকক মাইকেলকে অনুমোদন দিতে রাজি ছিলেন। অন্যান্য বিচারপতিদের মধ্যে জর্জ লক, হেনরী

ভিনসেণ্ট বেইলি, জন প্যাকস্টন নরম্যান ও ফ্রান্সিস কেম্প প্রধান বিচারপতিকে সমর্থন করেছিলেন। বিচারপতি ফ্রেডারিক গ্লোভার ও ওয়াল্টার স্কট সেটন-কার কোন আপত্তি করেননি। কিন্তু বিচারপতি জ্যাকসন ও ম্যাকফারসন বললেন যে মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর প্রয়োজন। ওদের কথায় প্রধান বিচারপতি মাইকেলকে অনুমোদন দিতে পারলেন না। সেদিন এ ব্যাপারে তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন এক বাঙালী বিচারপতি। তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত। মাইকেলের অপমান তাঁর কাছে সারা বাঙালী জাতির অপমান বলে মনে হয়েছিল। তিনি চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে মাইকেলকে বললেন কিছু প্রশংসাপত্র জোগাড় করতে। এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতির কাছ থেকেও আটই এপ্রিল তারিখে মাইকেলের কাছে চিঠি গেল তিনি যেন নিজের চরিত্র ও সুনাম সম্বন্ধে যোগ্য প্রশংসাপত্র আদালতে দাখিল করেন।

পঁচিশে এপ্রিল মাইকেল প্রধান বিচারপতির চিঠির জবাব দিলেন এবং সঙ্গে বেশ কিছু পরিচয় ও প্রশংসাপত্র পাঠালেন। তিনি লিখলেন এই সব নেটিভ জেণ্টলমেন তাঁকে ভালভাবেই জানেন এবং তিনি আশা করেন তাঁদের প্রশংসাপত্র অবশ্যই আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে।

আবার বিচারপতিদের সভা বসল। প্রশংসাপত্রগুলো দেখে তাঁরা হতবাক। বুঝতে পারলেন সমাজের কোন স্তরের লোকজনের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয়। সে যুগে কলকাতার যে সব স্বনামধন্য লোক মাইকেলকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরলাল শীল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, টিপু সুলতানের ছেলে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, রমানাথ লাহা, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতীয় হর্টি এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতি প্যারিচাঁদ মিত্র, গণেন্দ্রনাথ মিত্র, হাইকোর্টের অ্যাটর্নি ব্রজনাথ মিত্র ও তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন।

এ ছাড়া মাইকেল আরও যাঁদের প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন তাঁদের

মধ্যে একটি চিঠিতে রাজা কালীকৃষ্ণ ও কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিত সে কথা জানাতে আমরা গর্ববোধ করছি। তিনি বনেদী দত্ত বংশের এক কৃতী সন্তান এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর চরিত্র অকলঙ্ক এবং অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী তিনি। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে তাঁকে দেখতে পেলে আমরা আনন্দিত হব।

রমানাথ ঠাকুর প্রধান বিচারপতিকে লিখে পাঠালেন, মাইকেলের সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমার গর্ব হচ্ছে। বাংলা দেশের এক অতি সম্মানিত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা সদর আদালতের একজন প্রথম শ্রেণীর উকীল ছিলেন। যদিও মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়, তবু তাঁকে আমি যেটুকু দেখেছি তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি তিনি প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত শিক্ষিত ভদ্রলোক। তাঁর চরিত্র ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তাতে আমি বিশ্বাস করি যে তিনি যে পেশা নিতে চলেছেন সেখানে তাঁর যোগ্যতার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু সকলের প্রশংসাপত্রের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্রখানি স্বকীয়তায় বিশিষ্ট এবং অতুলনীয়। বিদ্যাসাগরের পরিচয়-পত্র সমর্থন জানিয়ে তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদনের জন্ম এক অভিজাত বংশে। সেই বংশের সঙ্গে বাংলার বহু স্বনামধন্য পরিবারের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর বাবা স্বর্গত রাজনারায়ণ দত্ত একজন প্রতিষ্ঠিত উকীল ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসাধারণ ও আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী। বাংলার সাহিত্য জগতে তাঁর সৃষ্টি বহুমুখী ও ব্যাপক। তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন অসংখ্য কবিতা ও বহু নাটকের মধ্যে। তাঁর এই সৃষ্টি নিঃসন্দেহে বাংলা দেশের লোকের কাছে তাঁকে প্রিয় ও সম্মানিত করেছে। কবি ও নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন আজ ঈর্ষার পাত্র।

আমি অসংকোচে তাঁর সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি যে ইংরাজি ভাষায় মধুসূদনের জ্ঞান যে কোন শিক্ষিত ইংরেজের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশি। তাছাড়া সংস্কৃত, ফার্সী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে। মাইকেল সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, উদার ও উচ্চ মনোভাব সম্পন্ন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক। মোটের ওপর আমাদের বিনীত মতামত এই যে তিনি বাংলা দেশের একটি অলংকার।

একজন নেটিভের সমর্থনে এতজন গণ্যমান্য লোকের সার্টিফিকেট আসতে পারে এ ছিল বিচারপতিদের ধারণার বাইরে। মাইকেল বিনয়ের সঙ্গে চিঠিতে লিখেছিলেন, যাঁদের পরিচয় পত্র দিলাম তাঁরা আমাকে ভালভাবেই জানেন। আমি তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত। আশা করি এগুলো আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে।

সত্যিই কিছু বলার ছিল না। বিচারপতিরা, যারা বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, হার মানলেন। আঠারশো সাতষট্টি সালের মে মাসের তিন তারিখে প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পিকক ও এগারজন বিচারপতি মিলে মাইকেলকে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার রূপে গ্রহণ করা অনুমোদন করলেন।

বিদায় লাউডন স্ট্রীট

স্পেন্সেস হোটেলের পাট চুকিয়ে মাইকেল মধুসূদন ছ' নম্বর লাউডন স্ট্রীটে একটি প্রশস্ত বাড়িতে উঠে গেলেন। সময়টা ছিল আঠারশো একাত্তর সালের মার্চ। বাড়ির মালিকের নাম গোবিন্দচন্দ্র দে। বাড়িটা ছিল ট্রাস্ট সম্পত্তি। যুক্তভাবে সেই সম্পত্তির ট্রাস্টি ছিলেন নবীন চন্দ্র বসু ও ক্ষেত্রমোহন দে। মাইকেল যখন সেই বাড়িটি ভাড়া নিলেন তখন একটা লিজের খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। সেই খসড়ায় অন্যান্য শর্তের মধ্যে প্রধান শর্ত ছিল আঠারশো একাত্তর সালের পয়লা মার্চ তারিখ থেকে তিন বছরের জন্যে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকার চুক্তির শর্ত। চুক্তিতে মাসিক দুশো টাকা হিসাবে ভাড়া

দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ মাইকেল ও ট্রাস্টিদের মধ্যে সেই চুক্তিপত্রটি সাক্ষরিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত হয়নি।

সেই সময়ে মাইকেল মধুসূদন নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাছাড়া শরীরও তখন একেবারে ভেঙে পড়েছে। লাউডন স্ট্রীটের বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার পর তিনি এক মাসেরও বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন নি।

বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্যে দু'জন ট্রাস্টি নবীনচন্দ্র বসু ও ক্ষেত্র মোহন দে আঠারশো একাত্তর সালের সতেরই আগস্ট তারিখে কলকাতা হাইকোর্টে মাইকেলের নামে মামলা দায়ের করলেন। দাবী মার্চ থেকে জুলাই পাঁচ মাসের বাড়িভাড়া বাবদ এক হাজার টাকা এবং অন্যান্য দেয় খাজনা তিরিশ টাকা। এই মামলা রুজু করার আগে আগস্ট মাসের দু' তারিখে ট্রাস্টিদের অ্যাটর্নি এক হাজার তিরিশ টাকার জন্যে মাইকেলকে একটা দাবীপত্র পাঠিয়েছিলেন। পরের দিন মাইকেল সেই পত্রের জবাবে লিখলেন ঃ

মহাশয়, আপনার গতকালের লেখা পত্রের উত্তরে আমি বিনীত ভাবে জানাই যে এই মুহূর্তে আপনার দাবী পূরণ করার বিন্দুমাত্র সামর্থ আমার নেই। কিন্তু আমি আশা করি আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে মিটিয়ে দিতে পারব। সে বিষয়ে কোন অন্যথা হবে না।

কিন্তু অঙ্গীকার সত্ত্বেও মাইকেল কথা রাখতে পারেননি। লাউডন স্ট্রীটের বাড়ির মালিক গোবিন্দ চন্দ্র দে ছিলেন মাইকেলের বিশেষ পরিচিত লোক। এই মামলা দায়ের করার আগে ট্রাস্টিরা যখন বার বার ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে তাগাদা দিতে থাকেন তখন গোবিন্দ-বাবুকে মাইকেল কয়েকখানি চিঠি লিখেছিলেন। শেষ চিঠিখানায় মাইকেল লিখলেন ঃ

আমি আপনার কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলাম যে আপনাকে লিখিতভাবে কিছু জানাব। গতকাল দুপুর একটার মধ্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ছিল। আমি আপনার দাবী পূরণের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, হতাশ হয়ে আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। যাই হোক, আশা করি

আগামী বুধবারের মধ্যে আপনার টাকা পরিশোধ করতে পারব। আপনার প্রিয় পুত্র ক্ষেত্রমোহন, যিনি আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে আপনি দয়া করে বলবেন ওই দিনে আমি লিজের চুক্তিও রেজিস্ট্রি করে দেব। আমার প্রথম কর্তব্য আপনার বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া। আপনি আমার হতাশা উপলব্ধি করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

এই সব চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় মাইকেল সে সময়ে কী ভীষণ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। শত চেষ্টা করেও তিনি কথা রাখতে পারেন নি। তারই ফলস্বরূপ এই মামলার উৎপত্তি। মামলা রুজু হওয়ার কয়েকদিন পরে কলকাতার শেরিফ মাইকেলের ওপর সমন জারি করলেন। মূল সমনের ওপর স্বাক্ষর দিয়ে মাইকেল আদালতের শীলমোহর দেওয়া একটি কপি গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইকেল এই মামলায় হাজির হননি। মামলাটা একতরফা বিচারের জন্যে মাননীয় বিচারপতি ফিয়ারের এজলাসে সেপ্টেম্বরের চার তারিখে নথিভুক্ত হল। বাদী পক্ষের হয়ে ক্ষেত্রমোহন সাক্ষ্য দিলেন। জবানবন্দী ও কৌঁসুলীর বক্তব্য শুনে বিচারপতি ফিয়ার মাইকেলের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিলেন। পাওনা এক হাজার তিরিশ টাকার ওপর মামলার খরচ বাবদ আরও দুশো পঁচিশ টাকা দেওয়ার আদেশ হল মাইকেলের ওপর। তারপরেও মাইকেলের তরফ থেকে কোন রকম আবেদন নিবেদন আসেনি। নবীন বসু ও ক্ষেত্রমোহন টাকা আদায়ের জন্যে হাইকোর্টে দরখাস্ত করলেন। চব্বিশে নভেম্বর তারিখে মাইকেলের নামে পরওয়ানা জারি করা হল। তার বলে মাইকেলের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি আটক ও নীলাম বিক্রয়ের আদেশ হয় হাইকোর্ট থেকে।
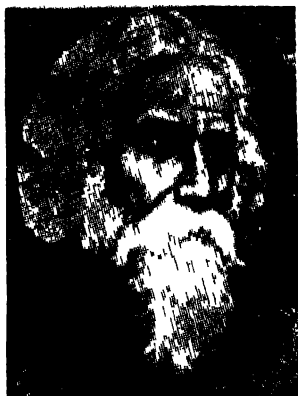
চামড়া ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ

একথা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময়ে চামড়ার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। কাঁচা চামড়ার সেই অংশীদারী কারবারে মোট চারজন অংশীদার ছিলেন। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রমণীমোহন ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'হর অ্যাণ্ড কোম্পানী।' কারবারের ম্যানেজার ছিলেন সারদা চরণ হর নামে ঠাকুরবাড়ির বহু পুরানো এবং বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী। শহরতলীতে চার নম্বর মুন্সী বাজারে এই ব্যবসায় লেনদেন চালাত।

গোলাম পাঞ্জেতুন অ্যাণ্ড কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায় সূত্রে 'হর অ্যাণ্ড কোম্পানী' বেশ কিছু চামড়া সরবরাহ করে-ছিল। একুশ নম্বর কাশীনাথ মল্লিক লেনে গোলাম পাঞ্জেতুন ব্যবসা চালাত। সেই প্রতিষ্ঠানের দুজন অংশীদার ছিল। একজনের নাম শেখ রহম আলি, অন্যজনের নাম ফকির মহম্মদ। তারা 'হর অ্যাণ্ড কোম্পানী'র কাছে নিয়মিত চামড়া কিনত। আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন তারিখে তারা দু'হাজার সাতশো টাকা দামের চামড়া ধারে কিনেছিল। তারপর টাকা আর

কিছুতে আদায় হয় না। বার বার তাগাদা করার পর এক হাজার চারশো টাকার মত তারা শোধ করেছিল। অনেক চেষ্টা করেও বাকি টাকা আর কিছুতেই আদায় করা গেল না। তখন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অংশীদাররা আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হলেন। হিসাবের খাতায় দেখা গেল বারশো বাহান্ন টাকা পাওনা আছে। সেই টাকার দাবীতে তাঁরা হাইকোর্টে নালিশ করলেন শেখ রহম আলি ও ফকির মহম্মদের নামে। 'হর অ্যাণ্ড কোম্পানী'র অ্যাটর্নি ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত সলিসিটর মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। মামলা রুজু করার তারিখ একুশে ডিসেম্বর আঠারশো ছিয়ানব্বই সাল।

শেখ রহম আলি ও ফকির মহম্মদ আদালতের সমন পেয়ে হাজির হল। বিধিনিয়ম অনুযায়ী জবাব দিল তারা। তাদের কাছে যে ওই টাকা পাওনা আছে একথা তারা মেনে নিয়েছিল। তবে তারা বলে-ছিল ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দা চলার জন্যে সময়মত বা কথামত তারা টাকাটা দিতে পারেনি। এ দোষ তাদের ইচ্ছাকৃত নয়। টাকা শোধ করার জন্যে আদালতে তারা কিছু সময় চাইল।

রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অংশীদারেরা রহম আলির প্রস্তাবে রাজি হলেন। মামলাটা আপসে মিটে গেল। রহম আলি ও ফকির মহম্মদ চারটি সমান কিস্তিতে ডিক্রীর টাকা শোধ করতে অঙ্গীকার করল। এই মামলায় বিচারপতি ছিলেন স্টিফেন জর্জ সেল।
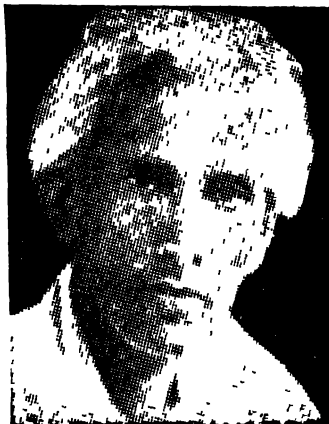
শরৎচন্দ্রের শেষ লেখা

উনিশশো আটত্রিশ সালের ষোলই জানুয়ারী। কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যিনি একদিন বলেছিলেন সংসারে যারা শুধু দিল পেলনা কিছুই, যারা বঞ্চিত উৎপীড়িত সর্বহারা, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসাব নিলনা কোনদিন, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই পেলনা সব থেকেও কেন তাদের কোন কিছুতেই অধিকার নেই, তারাই দিল আমার লেখনীর মুখ খুলে, তারাই পাঠাল আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে—সেই মানুষটি নিঃশব্দে অকালে চলে গেলেন। দিকে দিকে শোকসভা হল। রবীন্দ্রনাথ শোক গাথা লিখলেন :

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে !

মৃত্যুর পাঁচদিন আগে শরৎচন্দ্র উইল করেন। তাঁরই নির্দেশে প্রখ্যাত অ্যাটর্নি নির্মলচন্দ্র চন্দ্র উইলটি তৈরি করেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কোনরকমে শরৎচন্দ্র তাতে নাম সই করেন। ইতিপূর্বে তাঁর যদি কোন উইল থাকে তা বাতিল বলে গন্য হবে। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জীবন স্বত্বে দান করেন স্ত্রী হিরন্ময়ী

দেবীকে। তবে তাঁর চব্বিশ নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে তাঁর ভাই সপরিবারে যেমন বাস করছিলেন তেমনিই তার বসবাসের অধিকার থাকবে। হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের ভাই প্রকাশ-চন্দ্রের ছেলেরা সম্পত্তির মালিক হবেন।

শরৎচন্দ্রের উইলটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তবে তা ভ্রাতৃস্নেহে ভাস্বর। কলকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে তাঁর যা টাকা ছিল তা ভাই প্রকাশের মেয়ের বিয়ের জন্যে খরচ করা হবে। বিয়ের খরচের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেই টাকা প্রকাশের ছেলেরা পাবে।

শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুজন তাঁর উইলে সাক্ষী হিসাবে সই করেন। একজন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। অপরজন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উনিশশো একচল্লিশ সালের ষোলই জুন হিরন্ময়ী দেবী হাইকোর্টে প্রোবেটের দরখাস্ত করলেন। মোট সম্পত্তির দাম ঘোষণা করে-ছিলেন ছত্রিশ হাজার টাকা। কলকাতার দুটি ব্যাঙ্কএ শরৎচন্দ্রের আমানত ছিল। লয়েড্‌স ব্যাঙ্কএ সাতশো আটষট্টি টাকা বারো আনা তিন পাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কএ ছিল দু'হাজার দুশো ছেচল্লিশ টাকা।

বালিগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িটি শরৎচন্দ্র নিজের অর্জিত টাকায় কিনেছিলেন। প্রোবেট নেওয়ার সময়ে বাড়ির দাম ধরা হয়েছিল পনের হাজার টাকা। জীবনের শেষ দিকে তিনি ওই বাড়িতেই থাকতেন। সেখান থেকেই অসুস্থ অবস্থায় ভিকটোরিয়া টেরেসের পার্ক নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। রেঙ্গুনের পাট চুকিয়ে কলকাতায় ফিরে শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুর অঞ্চলে ছিলেন। তারপর দক্ষিণপূর্ব রেলপথে দেউলটি স্টেশন থেকে কিছু দূরে পানিত্রাস গ্রামে সামতাবেড় অঞ্চলে তিনি একটি বাড়ি তৈরি করেন। বাড়িটা ছিল কাঁচা। বাড়ি ও জমি মিলিয়ে জায়গা ছিল পঁচিশ বিঘা। সেই সম্পত্তির দাম ধরা হয়েছিল সাড়ে ছ'হাজার টাকা।

সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত বই এর প্রকাশক ছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্‌স। মৃত্যুর সময়ে ওই প্রকাশন সংস্থার কাছে পাওনা ছিল কপিরাইট বাবদ চার হাজার সাতশো টাকা, অবিক্রীত মজুদ বই এর দাম পাওনা ছিল এক হাজার টাকা। তাঁর

ব্যক্তিগত ব্যবহার-যোগ্য জিনিসের মধ্যে অত্যন্ত শখের ছিল একখানি মরিস মোটরগাড়ি। গাড়িটার নম্বর ছিল ৩৭৫৪০। গাড়িখানার দাম ধরা হয়েছিল সাতশো টাকা। শরৎচন্দ্রের দেনা ছিল মোট দু'হাজার। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে এক হাজার ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স প্রকাশনের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এক হাজার। বিচারপতি অমরেন্দ্র নাথ সেনের কাছে হিরন্ময়ী দেবীর দরখাস্তের শুনানী হয়। সম্পত্তি জীবন স্বত্বে দান করার জন্যে জামানতের প্রশ্ন ওঠে। কারণ উইল অনুযায়ী হিরন্ময়ী মারা যাওয়ার পর প্রকাশের ছেলেরাই উত্তরাধিকারী। হিরন্ময়ী দেবী আদালতের নির্দেশ মত দশ হাজার টাকার সিকিউরিটি দিলেন এবং সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার পেলেন। তাঁর পক্ষে অ্যাটর্নি ছিল জি. সি. চন্দ্র অ্যাণ্ড কোম্পানী।

আদালতে রাণী রাসমণি

রাণী রাসমণি একদিন বড় জামাই রামচন্দ্রকে ডেকে বললেন, তোমার বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ আছে। জমিদারী দেখাশুনা করতে গিয়ে তোমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অনেক গরমিল দেখা যাচ্ছে। আমাকে তুমি এখনি টাকার হিসেব বুঝিয়ে দাও।

রাসমণির কথায় রামচন্দ্র অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। স্ত্রী পদ্মমণিকে জানালেন সব কথা। খাতাপত্র সবই রাসমণির কাছে আছে। নতুন করে হিসাব দেওয়ার কিছু নেই। কৈফিয়তের ধার ধারেন না তিনি।

কলকাতার জানবাজারের সম্পন্ন গৃহবধূ বিচক্ষণ জেদী রাসমণি পেছিয়ে যাবার পাত্রী নন। তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাস ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। আঠারশো ছত্রিশ সালের জুন মাসে রাজচন্দ্র মারা যাওয়ার পর শক্ত হাতে হাল ধরেছেন তিনি। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। চার মেয়ের মধ্যে করুণাময়ী বিয়ের পর মারা যায়। রামচন্দ্র ছিলেন বড় জামাই এবং বড় মেয়ের নাম পদ্মমণি।

বৃহৎ সম্পত্তির মালিকানা ছাড়াও রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস সে

যুগে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলে পরিচিত ছিলেন। রাসমণি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, বিচক্ষণ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাছাড়া তিনি ছিলেন ভক্তিমতী ও দানশীলা। তবে সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী পর্দানশীন হিন্দু মহিলার বাইরের লোকের সামনে আসা নিষিদ্ধ ছিল। সেই কারণে ব্যবসা ও সম্পত্তি দেখা শোনা করার ব্যাপারে তিনি বড় জামাই রামচন্দ্রকে ম্যানেজার নিয়োগ করেন।

রামচন্দ্রকে বার বার বলা সত্বেও যখন তিনি হিসাব বুঝিয়ে দিলেন না তখন রাসমণি তাকে জবাব দিলেন এবং তার জায়গায় অপর জামাই প্যারীমোহন চৌধুরীকে বহাল করলেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বাস ভঙ্গ ও তহবিল তছরূপের জন্যে দায়ী করে তিনি রামচন্দ্র ও পদ্মমণির নামে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করলেন। অন্যান্য অভিযোগ ছাড়াও হিসাবের খাতায় তখন ঘাটতি দেখা গিয়েছিল সাতষট্টি হাজার সাতশো সাতানব্বই টাকা চোদ্দ আনা ছ' পাই। মামলা দায়ের করার তারিখ আঠারশো পঞ্চান্ন সালের সতেরই জানুয়ারী। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাসমণি যে সব অভিযোগ এনেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি হল, রামচন্দ্র হিসাবে কারচুপি করে অনেক টাকা নিজের নামে রেখে দিয়েছেন। মধুসূদন সান্যালের কাছে পাওয়া নদীয়ার জেলা আদালতে জমা পড়া তিন হাজার দুশো টাকা তুলে নিয়ে সে টাকা তিনি রাসমণিকে ফেরত দেননি। হিসাবের খাতায় দেখা গেছে, বিভিন্ন সময়ে রামচন্দ্র রাসমণির কাছে চোদ্দ হাজার টাকা নিয়ে বেলে-ঘাটায় একটা কমিশন এজেন্সির ব্যবসা খোলেন। সেই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর লাভ করে সব টাকা নিজে ভোগ করছেন। অপর অভিযোগ, রামচন্দ্রের হাতে রাসমণির যে তহবিল ছিল তা থেকে রামচন্দ্র তার আত্মীয় শ্যামাচরণ দাসকে বিনা জামানতে ছ' হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই টাকার কিছুই আদায় হয়নি।

রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস নাবালক পৌত্র গণেশ চন্দ্র দাস, যদুনাথ চৌধুরী ও ভূপাল চন্দ্র বিশ্বাসের নামে ছ' হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনেছিলেন। সেগুলো রামচন্দ্রের কাছে গচ্ছিত ছিল। গণেশ, যদুনাথ ও ভূপাল সাবালক হওয়ার পর রামচন্দ্র

সাদা কাগজে তাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। তাদের তিনি বলেন পাওনা সুদ আদায়ের জন্যে সই দরকার। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেগুলো ভাঙিয়ে আসল ও সুদের টাকা রামচন্দ্র আত্মসাৎ করেছেন। রামচন্দ্রের কাছে রাসমণির আরও কতকগুলো গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি রাখা ছিল। সেগুলোর মোট দাম প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। সেই সব টাকা দিয়ে রামচন্দ্র স্ত্রী পদ্মমণির নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণপত্র কিনেছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে রামচন্দ্র রাসমণিকে দিয়ে অনেক সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। রাসমণিকে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, লগ্নী করা টাকার সুদ আদায়ের জন্যে সই করা কাগজ দরকার। পরে দেখা গেছে সেই সইগুলো মূলধন হিসাবে কাজে লাগিয়ে রামচন্দ্র টাকা তুলে নিয়েছেন। সেই টাকাব পরিমাণ লক্ষাধিক।

হুগলী নদীর তীরে রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে যে কালী ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তা তৈরীর সময়ে দেখাশোনার ভার দেওয়া হয় রামচন্দ্রের ওপর। সে কাজে তার গাফিলতির জন্যে রাসমণির বহু টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আদালতের কাছে রাসমণি আবেদন জানালেন তাঁর জমিদারীর ম্যানেজার থাকার সময়ে রামচন্দ্র যে সব লেনদেন করেছেন তার তদন্ত করা হোক। হিসাবে যদি রাসমণির কিছু পাওনা থাকে তাহলে তা ফেরত দিতে বাধ্য করা হোক। রামচন্দ্র বা পদ্মমণির নামে যদি কোন সম্পত্তি কেনা হয়ে থাকে তাও যেন রাসমণিকে অর্পণ করা হয়। কারণ রামচন্দ্রের নিজের কোন আয় ছিল না। জামাই ও মেয়ে সম্পূর্ণরূপে রাসমণির ওপর নির্ভরশীল। রাসমণির পক্ষে অ্যাটর্নি ছিলেন ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীটের উইলিয়ম টমাস ডেনম্যান।

কোর্ট থেকে নোটিশ পেয়ে অভিযোগের জবাব দিলেন রামচন্দ্র ও পদ্মমণি। রাসমণির জমিদারীর ম্যানেজার তিনি কোন কালেই ছিলেন না। সে বিষয়ে কোন লিখিত নিয়োগ-পত্রও নেই। কেবল-মাত্র কতকগুলো ব্যাপারে রাসমণি তার ওপর নির্ভর করতেন। সে গুলো হল, গৃহস্থালীর কিছু কাজকর্ম দেখাশোনা করা এবং কাছারী ও

কালেকটরীতে সময় বিশেষে রাসমণির বাংলা ভাষায় সই করা দলিল বা আবেদন পত্র প্রত্যায়িত করা। জমিদারীতে রাসমণির নিযুক্ত বহু দেওয়ান, মোহরার, খাজাঞ্চী ও সরকার আছেন। টাকা পয়সার সঙ্গে রামচন্দ্রের কোনই সম্পর্ক নেই। বেলেঘাটায় কমিশন এজেন্সির ব্যবসা তিনি রাসমণির হয়েই পরিচালনা করতেন এবং তার হিসেব সবই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই ব্যবসার হিসাব পত্র রাখার ভার ছিল দেবী প্রসাদ ঘোষ ও রামমোহন পাল নামে তুজন লোকের ওপর। তহবিল তছরূপ বা সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আশ্চর্যের বিষয়, রামচন্দ্র ও পদ্মমণি তাদের বিবৃতি দাখিল করার পর রাসমণি আর অগ্রসর হননি। জানিনা তিনি জামাই এর বিরুদ্ধে মামলা চালাতে দ্বিধা করেছিলেন কি না। অথবা মেয়ে পদ্মমণির মুখ চেয়ে পিছিয়ে এসেছিলেন কি না। আঠারশো উনষাট সালের তেরই জানুয়ারী রাসমণি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করলেন মামলা তুলে নেওয়ার জন্যে। একটি সোলেনামায় তুপক্ষ সই করল এবং মামলা খারিজ হয়ে গেল। রামচন্দ্র ও পদ্মমণির পক্ষে অ্যাটর্নি ছিল অ্যালান অ্যাণ্ড জাজ নামে একটি ফার্ম।
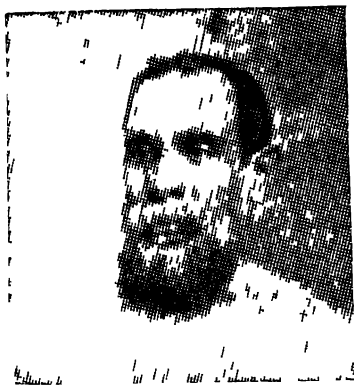
মানহানির দায়ে সুরেন্দ্রনাথ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকা সে যুগে নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য বিখ্যাত ছিল। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধরতে সাংবাদিক সুরেন্দ্রনাথ কোনদিন পিছিয়ে যাননি। তার জন্যে তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। রাজদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয়েছে। আদালত অবমাননার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে।

উনিশশো সালের পঁচিশে জুলাই তারিখে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'তে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করলেন। জনৈক ইউরোপিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। সংবাদে বলা হয়, আসামের পত্রিকা 'উইকলি ক্রনিক্‌ল' প্রকাশ করেছে যে আসাম কমিশনের একজন সদস্য যিনি ধুবড়ীতে একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রূপে নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি সাসপেণ্ড হয়েছেন। আসামের কমিশনার এবং গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার জেলা পুলিশ সুপারের সহায়তায় বিষয়টির গোপন তদন্ত করছেন। এ পর্যন্ত যা সংবাদ পাওয়া গেছে তা সত্যিই চমকপ্রদ।

এই ঘটনার নায়ক এফ. এম. জলি ধুবড়ীতে ডাক্তার হেণ্ডারসনের সঙ্গে একই বাংলোয় থাকতেন। ডাক্তার হেণ্ডারসন

বহিরাগতদের ইনস্পেকটর হিসাবে কাজ করতেন। গত নভেম্বরে বাংলোর ঘর থেকে ডাক্তারের ছশো টাকা চুরি যায়। খবরটা পুলিশে জানানো হয় কিন্তু পুলিশ এই চুরির কোন কিনারা করতে পারে নি। ধুবড়ীর একজন পুলিশ অফিসার তদন্তের কাজে কলকাতায় এসে জানতে পারেন মিস্টার জলি ম্যানটন কোম্পানী থেকে একটি বন্দুক কিনেছেন। সেই বন্দুকটি তার কাছে পাওয়া গেছে। ওপর মহলে যখন এইসব কথা নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন জলি দুবছরের ছুটি চেয়ে একটি দরখাস্ত করেছিলেন। আবেদনে তিনি বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকার জন্যে ছুটি মঞ্জুর করা হয়নি। বিভাগীয় তদন্ত খুব গোপনভাবে চলছে। এজন্যে ঘটনার বিশদ বিবরণ সাধারণের জানার কোন সুযোগ নেই।

'আসাম ক্রনিকল' এর এই সংবাদ উদ্ধৃতির কয়েকদিন পরে আগস্ট মাসের সাত তারিখে 'বেঙ্গলী'তে সম্পাদকীয় মন্তব্য দিয়ে আর একটা খবর ছাপা হয়।—আমরা জানতে পেরেছি, আসামের অতিরিক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মিস্টার জলিকে একটি গোপন তদন্তের পর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপারটি গোপনভাবে সমাধা হওয়ার জন্যে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এক বিশেষ প্রতিনিধি 'বেঙ্গলী' সম্পাদককে জানিয়েছেন, মিস্টার জলির অপরাধের বিবরণ সিলেট থেকে তারযোগে আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার কাগজে যে খবর ছাপা হয়েছে তাতে সত্য কিছুমাত্র বিকৃত হয়নি। তদন্তের পর আসামের চীফ কমিশনার মিস্টার জলিকে অপসারিত করেছেন। এখানে ভারতীয়দের মধ্যে এই ঘটনা বেশ চাঞ্চল্য এনেছে। এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে মিস্টার জলির পরিচয় চোর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারামতে জলির প্রকাশ্য বিচার হয়নি। স্বজাতির সম্মান বজায় রাখার জন্যে গোপনভাবে বিচার সমাধা করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কোন এক মিস্টার হান্টার জলির পদে বহাল হতে চলেছেন। হান্টার মাদ্রাজের পদচ্যুত পুলিশ সুপার।

সুতরাং এ কথা ভাবা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না যে পদচ্যুত জলিকেও হয়ত ভারতের অন্য কোন প্রান্তে নতুন চাকরিতে বহাল করা হবে যেখানে তার আসামের কুকীর্তি অজানা থাকবে। মিস্টার জলির বিষয়ে আরও জানা গেছে, আগে তিনি মণিপুরে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে কাজ করতেন।

এর পরের দৃশ্য কলকাতা হাইকোর্টের এজলাস। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নামে জলি মানহানির মামলা করলেন। দাবী করলেন বিশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ। তার সম্পর্কে পঁচিশে জুলাই, সাত ও আটই আগস্টে যে সব খবর ছাপা হয়েছে তা রীতিমত আপত্তিজনক।

আদালতের সমন পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ আর্জির জবাবে বললেন, সিলেটের নিজস্ব প্রতিনিধির খবরের ভিত্তিতে 'বেঙ্গলী'তে জলি সম্পর্কে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। 'বেঙ্গল টাইম্স' নামে একটি পত্রিকায় এ খবর আগেই বেরিয়েছিল। 'বেঙ্গলী'তে ছাপা সংবাদ তারই পুনরাবৃত্তি। সব খবরই জনসাধারণের স্বার্থে এবং সুস্থ সাংবাদিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ছাপা হয়েছে।

হাইকোর্টে প্রায় তিনবছর ধরে এই মামলা চলেছিল। জলি অবশ্য এই সঙ্গে আরও তুটো মামলা দায়ের করেছিলেন। একটায় প্রতিবাদী ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষ এবং অপরটায় নরেন্দ্রনাথ সেন। সে তুটো মামলা আপোসে মিটমাট হয়ে যায়। যাই হোক, সুরেন্দ্রনাথের মামলায় আসাম ও কলকাতার বহু লোক সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। জলির পুরো নাম ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকগ্রেগর হ্যালিগান জলি। সরকারি নথিপত্র তলব করে এবং তুপক্ষের সওয়াল জবাবে যা জানা গিয়েছিল তা হল, জলির বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে চুরির কোন অভিযোগ আনা হয়নি। চুরির বিষয়ে একটা তদন্তে তিনি একজন সাক্ষী ছিলেন মাত্র। তার বিরুদ্ধে যা চার্জ ছিল তা কাজে অবহেলা ও অন্যান্য কিছু আপত্তিকর কাজের জন্যে। আঠারশো নিরানব্বই সালের ষোলই ডিসেম্বর জলি কোন একটি বিষয়ের তদন্তের জন্যে আসামের কোন জায়গায় সফর করেছেন বলে ভ্রমণভাতা নিয়েছিলেন। কিন্তু ওই তারিখে সরকারি কাজ না করে তিনি

কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। সেই মিথ্যাচারের জন্যে তার বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছিল। এ কথা ঠিক যে জলি ডাক্তার হেণ্ডারসনের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন। নভেম্বরের দু তারিখে ডাক্তারের বাক্স ভেঙে টাকা চুরি যায়। বাংলোর বাগান থেকে পুলিশ ভাঙা বাক্সটা উদ্ধার করে। এই চুরির কিনারা করতে এসে পুলিশ অবশ্য একথা বলে যে, বাইরের কোন লোকের দ্বারা এই অপরাধ ঘটেনি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে জলি কোন একটি সরকারি মামলার তদ্বিরের ব্যাপারে আসামের এক প্রান্তে যাওয়া আসার জন্যে সরকারি তহবিল থেকে কিছু টাকা নেন। পরে প্রকাশ পায় জলি দুদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। চৌরঙ্গিতে কন্টিনেণ্টাল হোটেলে উঠেছিলেন। ষোল তারিখে তিনি রেসের মাঠে গিয়েছিলেন এবং সেই সন্ধ্যায় হোটেলের ম্যানেজার মিস্টার মার্কনের কাছে চারশো টাকা জমা রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওই টাকা রেসে জিতেছেন। সন্ধ্যায় হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি চেরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর দোকানে গিয়ে একটি লেডিজ রিস্টওয়াচ কিনেছিলেন। চেরী কোম্পানীর দোকান থেকে ঘড়ি কিনে যখন জলি একশো টাকার একখানি নোট দেন তখন দোকানের মালিক সেই নোটখানার ওপর তাকে নাম ঠিকানা লিখে দিতে বলেন। জলি কন্টিনেণ্টাল হোটেলের নাম ঠিকানা লিখতে যাচ্ছিলেন। দোকানদার আপত্তি জানালে তিনি ঠিকানা লেখেন ৮/১ রিভারসাইড রোড, ব্যারাকপুর এবং নাম সই করেন জে গ্রাণ্ডি। সেইদিনই দুপুরে জলি ম্যানটন কোম্পানীতে গিয়ে একটা বন্দুক কিনেছিলেন। আদালতে সাক্ষী দিতে এসে এইসব কথা বলেছিলেন হোটেলের ম্যানেজার মিস্টার মার্কন, চেরী কোম্পানীর মালিক চারুচন্দ্র ঘোষ এবং ম্যানটন কোম্পানীর সেল্‌সম্যান। চারুচন্দ্র ঘোষ তার সাক্ষ্যে বলেছিলেন, তার দোকান থেকে লেডিজ রিস্টওয়াচ কেনার কিছুদিন পরে জলি সম্পর্কে তার কাছে একটি পুলিশী তদন্ত হয়। কিন্তু সে সময়ে চারুচন্দ্র ঘোষ যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নি। কারণ জলির চেহারাটা তিনি স্মরণে আনতে পারেন নি। আদালতে

তিনি জলিকে ঠিকমত সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। ঘড়ি কেনার সময়ে জলির মাথায় একটা কাপড়ের টুপি ছিল। নোটের ওপর নাম ঠিকানা লেখার সময়ে জলি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের কৌঁসুলী জলিকে শতাধিক প্রশ্ন করেছিলেন। সে সব প্রশ্নের জবাব দিতে কখনও তার মুখ উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল কখনও রাগে জড়তা এসেছিল কথায়। জলির বংশগৌরব বলার মতো কিছু ছিল না। তার শিক্ষা ছিল সাধারণ স্তরের। কর্মজীবনে মণিপুরে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে তার হাতেখড়ি। তখন তার মাসিক মাইনে ছিল আশি টাকা। জেরার উত্তরে জলি স্বীকার করেছিলেন, বরাবরই তার দারুণ অর্থাভাব ছিল। অর্থাভাবের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। পাওনাদারদের অপমান সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়; বলে যায়, সংসারে সচ্ছলতা ফিরে না এলে সে আর ফিরবে না। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর কাছে টাকা ধার চেয়ে জলি ব্যর্থ হয়েছিলেন। আদালতে জলির কথাগুলো ছিল সামঞ্জস্যবিহীন ও অসংলগ্ন। আদালতে সওয়ালের সময়ে সুরেন্দ্রনাথের কৌঁসুলী বলেছিলেন, চুরি যাওয়া নোটের একখানি ভাঙিয়ে জলি রিষ্টওয়াচ কিনেছিলেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন শেষপর্যন্ত রহস্যই থেকে যায়। জলি কলকাতায় এসেছিলেন কেন? কেনই বা তিনি কলকাতায় আসার ব্যাপারটা গোপন করতে চেয়েছিলেন? সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য, চুরি করা নোটগুলো ভাঙানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। বিষয়টা হাল্‌কা করে দিয়ে জলির কৌঁসুলী হেসে বলেছিলেন, গোপনে একটা প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই জলি কলকাতায় এসেছিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারক ছিলেন ষ্টিফেন জর্জ সেল। তিনি বললেন, ডাক্তার হেণ্ডারসনের চুরি যাওয়া নোটের কয়েকখানি জলি ভাঙিয়েছেন বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা প্রমাণিত হয় নি। অন্যতম প্রধান সাক্ষী চেরী কোম্পানীর চারুচন্দ্র ঘোষকে তদন্তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আসামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি জলিকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারেন নি। অথচ

হাইকোর্টে সাক্ষী দিতে এসে জলিকে সনাক্ত করে তিনি বলেছেন, এই লোককেই তিনি হাতঘড়ি বিক্রী করেছিলেন। আসামে জলিকে চিনতে না পারার কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন জলি তখন গোঁফ কামিয়ে ফেলেছিল। সেইজন্যে তাকে তিনি চিনতে পারেননি। বিচারপতি সেল চারুচন্দ্রর সাক্ষ্য মেনে নেননি। জজসাহেব একথাও মেনে নিতে পারেন নি যে, চুরি করা নোট ভাঙানোর জন্যেই জলি কলকাতায় এসেছিলেন। জলির ব্যারিস্টারের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি বললেন, গোপনে একটু ছুটি উপভোগের জন্যেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। জলি কর্তব্যে অবহেলা করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার জন্যে শাস্তিও তিনি পেয়েছেন। কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা সরকারী তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু হেণ্ডারসনেব টাকা তিনি চুরি করেছেন তা প্রমাণিত হয় নি। এখানেও তা প্রমাণ করতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যর্থ হয়েছেন। জলির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পর যখন দেখা গিয়েছিল যে হেণ্ডারসনের টাকা চুরির ব্যাপারে জলি জড়িত নন তখন সে খবর সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সে কথা পত্রিকায় ছাপিয়ে তার ভুল শুধরে নেননি।

মামলার রায় দিতে গিয়ে জজসাহেব বললেন, সুরেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমালোচনা করেছেন বলে যে দাবী জানিয়েছেন সেটা তলিয়ে দেখা দরকার। কোন লোকের নৈতিক চরিত্র নিয়ে ব্যাঙ্গ করাকে সমালোচনা বলে না। 'বেঙ্গলী'-তে যে খবর ছাপা হয়েছে তা পড়ে যে কোন লোক মিস্টার জলিকে চোর ভাববে। সরাসরি তাকে চোর না বললেও ইঙ্গিত ছিল অর্থপূর্ণ। এইসব অসত্য খবর ছাপার জন্যে জলি তার সুনামের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং সাধারণের কাছে নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। সেই ক্ষতি কতখানি তা আমার পক্ষে বলা শক্ত। বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথকে তিনশো টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিলেন। একটা নিষ্ঠুর সত্য সেদিন চাপা পড়ে গেল। ইংরেজ রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ শাসক সম্প্রদায় সহ্য করতে পারেননি। কর্তব্যজ্ঞানহীন একজন বৃটিশ নাগরিকের অপরাধ ও চরিত্রহীনতা ঢাকার জন্যে বিভাগীয় তদন্তে তাকে চুরির দায় থেকে

মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। জলি সেদিন বেঁচেছিলেন কলঙ্ক থেকে। কিন্তু সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে মূল্য দিতে হল সুরেন্দ্রনাথকে।

উৎপাটিত শালগ্রাম

আঠারশো তিরাশি সাল। হাইকোর্টে বিচারপতি জন ফ্রীম্যান নরিসের কাছে একটা মামলা চলছিল। বাদী ছিল বড়বাজারের কাশীনাথ দাস ক্ষেত্রী বিবাদী সুভদ্রা দেবী। বিষয় আশয় ও দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে ওদের ঝগড়া। আরও বড় প্রশ্ন ছিল দেববিগ্রহের মালিকানার প্রশ্ন। উনিশে এপ্রিল তারিখে সেই মামলায় একটি আবেদনের শুনানীর সময়ে বিচাবপতি নরিস আদেশ দিলেন বড়বাজারের দেবালয় থেকে শিবলিঙ্গকে তুলে এনে আদালতে হাজির করা হোক।

সেদিন বিচারপতিয় সেই অভাবনীয় হুকুমে সারা কলকাতা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দেববিগ্রহকে মন্দির থেকে তুলে কোর্টে আনার ঘটনা সেটাই বোধ হয় প্রথম। ধর্মপ্রাণ উকিল ব্যারিস্টাররা বিচলিত হয়ে উঠলেন। কেঁপে উঠলেন এজলাসের ব্রাহ্মণ দোভাষী। কিন্তু আদেশ বহাল। হাকিম নড়ে হুকুম নড়ে না। ফলে শিবলিঙ্গটি আদালতে আনা হল। নরিস সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শিবলিঙ্গের বয়স পরীক্ষা করে মতামত দিলেন।

এই ঘটনায় নড়ে উঠল জনমত। সোচ্চার হল বুদ্ধিজীবির দল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বেঙ্গলী কাগজে আটাশে এপ্রিল তারিখে বিচারপতির কঠোর সমালোচনা করলেন। মির্ভীক সুরেন্দ্রনাথ বললেন, হাইকোর্টের বিচারপতিরা বিচারকের আসনে বসে প্রায়ই ভুল করে থাকেন। সম্প্রতি এমন একজন বিচারপতির চরম অনুপযুক্ততার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাঁর নাম জন ফ্রিম্যান নরিস। একটি শালগ্রাম শিলাকে আদালতে হাজির করানোর মধ্যেই তাঁর জবরদস্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর গৃহদেবতাকে কেন্দ্র করে আগে সুপ্রীম কোর্টেও অনেক মামলা হয়েছিল। হাইকোর্টেও এর আগে একাধিক মামলা হয়েছে। কিন্তু আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার

সম্মান ইতিপূর্বে আর কোন গৃহদেবতা অর্জন করেন নি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, বিগ্রহটি দেখে বিচারপতি নরিস বলেছেন, সেটি কোন মতেই একশো বছরের পুরানো হতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিচারপতি শুধু আইনেই পণ্ডিত নন, হিন্দু দেবমূর্তির বয়স নিরুপণেও সমান দক্ষতা তাঁর আছে। মন্তব্যের শেষ ছত্রে সুরেন্দ্রনাথ আরও লিখেছিলেন, ধর্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণ আদালতের এই খামখেয়াল বরদাস্ত করবেন কিনা সে বিচার তাঁদেরই ওপরে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শাসিত জনগণের আপন আপন ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা শাসক সরকারের অন্যতম কর্তব্য। সরকারকে সুরেন্দ্রনাথ অনুবোধ জানিয়েছিলেন জজসাহেবের কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে।

'বেঙ্গলী'তে প্রকাশিত সমালোচনা দেখে জজ সাহেব নরিস ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর প্রতি এই তিক্ত কটু কষায় সমালোচনা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর রামকুমার দে। প্রকাশের স্থান কলকাতার নিয়োগীপুকুর লেন। বিচারপতি নরিস দুজনের ওপর রুল জারী করলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের দুজনকে আদালতে হাজির হয়ে এরকম অশালীন মন্তব্য করার ব্যাপারে তাদের আচরণ কেন দণ্ডনীয় হবে না সেই কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হবে। কারণ, 'বেঙ্গলী'তে ছাপা মন্তব্য আদালত অবমাননাজনক এবং জজসাহেবের মানহানিকর।

মে মাসের চার তারিখে সুরেন্দ্রনাথ আদালতে হাজির হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব দিলেন। নিবন্ধটি লেখার ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের ওপর নিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, প্রকাশক ও মুদ্রক রামকুমার দে সম্পূর্ণ নির্দোষ। রামকুমার ইংরাজি ভাল জানেন না। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তিনি সুরেন্দ্রনাথের ওপরই নির্ভরশীল। সমসাময়িক অন্য একটি পত্রিকায় আদালতের এই ঘটনাটি ছাপা হলে সেটি তাঁর নজরে পড়ে। তবে, 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁর বক্তব্য কিছুটা রূঢ় হওয়ায় দুঃখিত, লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তবে একথাও ঠিক যে জজসাহেবের আচরণ তিনি জনসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরার

প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ন্যায়বিচারের জন্য। বিচারালয়ের মর্যাদা রক্ষা করা যেমন বিচারকের কর্তব্য, তেমনি সাংবাদিকের কর্তব্য হল আইনসম্মত অধিকারের অসম্মানকর ব্যাপার জনসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরা।

পরের দিনই এই মামলার শুনানীর ব্যবস্থা হল। পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে ফুলবেঞ্চ গঠন করা হল। তাঁরা হলেন প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ, বিচারপতি রমেশ চন্দ্র মিত্র, কানিংহ্যাম, ম্যাকডোনেল এবং বিক্ষুব্ধ জন ফ্রিম্যান নরিস। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে আটর্নি ছিলেন গণেশ চন্দ্র চন্দ্র এবং কৌঁসুলি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্যে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের বিচার সে যুগের হাইকোর্টের ইতিহাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিচারপতির আচরণে প্রতিবাদের সুর হয়তো অনেকের মনে ধ্বনিত হয়েছিল কিন্তু সেই নির্মম শাসন ও শোষণের যুগে বাধ্য হয়ে তাদের নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের বিবৃতি বিচার বিবেচনার পর জজসাহেবেরা বললেন, সুরেন্দ্রনাথ গুরুতর অপরাধে অপরাধী। আদালতের কাজের সমালোচনা করে সুরেন্দ্রনাথ অন্যায় করেছেন। দেববিগ্রহটি কোর্টে নিয়ে আসার ব্যাপারে সেই মামলার বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ণ সম্মতি ছিল। সুভদ্রা দেবী ও কাশীনাথের মামলায় দুপক্ষের উকিল ও অ্যাটর্নিরা ছিলেন হিন্দু। তাঁদের দিক থেকেও কোন আপত্তি ওঠেনি। জজসাহেব নরিস শিবলিঙ্গ কোর্টে আনার ব্যাপারে নিজের খেয়ালখুশি মতো আদেশ দেননি। অনেক ভেবে চিন্তে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন। এমনকি এবিষয়ে একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিতের কাছেও পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। দেবমূর্তিটি এজলাসের দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসার বিধান দিয়েছিলেন তিনি। ঘটনার সঠিক বিবরণ না জেনে অপ্রিয় মন্তব্য করার জন্যে সুরেন্দ্রনাথের আচরণ দণ্ডনীয়।

সরকারপক্ষের ব্যারিষ্টারের সওয়ালের জবাবে সুরেন্দ্রনাথের কৌঁসুলীর কোন যুক্তিই আদালত মানতে চাইল না। দুমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। একমাত্র বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র অন্যান্য

বিচারপতিদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড সমর্থন করেননি। সে যুগেব বিদেশী শাসনের ভয়াবহ কঠোরতার মধ্যেও এই তেজস্বী বাঙালী বিচারপতি সেই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে নিজের নির্ভীক মত ব্যক্ত কবেছিলেন। বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, অন্যান্য বিচারকদেব সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তিনি অক্ষম। অনেকদিন আগের আদালত অবমাননার একটি ঘটনাব উল্লেখ করে তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু তার ওপর অনেক লঘু দণ্ড আরেপিত হয়েছিল। রমেশ মিত্র তাঁর আলাদা রায়ে বলেছিলেন, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে এবং আদালতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেখানে কারাদণ্ডের প্রশ্ন না আসাই ভাল। হাইকোর্টেব দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত লড়েছিলেন। সে আর এক কাহিনী।

নির্বাসিত রাজকুমার

অধুনা বাংলাদেশের এক বৃহৎ অংশ নিয়ে ছিল ভাওয়াল রাজার জমিদারী। ঢাকা শহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে ভাওয়াল রাজার প্রাসাদ। রাজা কালীনারায়ণ রায়ের একমাত্র ছেলে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। রাজেন্দ্রনারায়ণ তিন ছেলে রেখে মারা গিয়েছিলেন। রণেন্দ্রনারায়ণ, রমেন্দ্রনারায়ণ ও রবীন্দ্রনারায়ণ। এবং তিনটি মেয়ে ইন্দুময়ী, জ্যোতির্ময়ী ও তারিণীময়ী। তাছাড়া রেখে গিয়েছিলেন স্ত্রী বিলাসমণি ও মা সত্যভামা দেবী। রণেন্দ্র, রমেন্দ্র ও রবীন্দ্রের স্ত্রীদের নাম যথাক্রমে সরযূবালা, বিভাবতী ও আনন্দকুমারী।

উনিশশো ন' সাল। অসুস্থ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ হাওয়া বদলের জন্যে দার্জিলিং গেলেন। উঠলেন সেখানকার বিখ্যাত হোটেল স্টেপ্ অ্যাসাইড-এ। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী বিভাবতী, বিভাবতীর বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, পরিবারের ডাক্তার, জমিদারি কাজে নিযুক্ত একজন অফিসার এবং কুমারের একান্ত সচিব। মে মাসের গোড়ার দিকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং আট

তারিখে মারা গেলেন। সেই রাত্রেই তার মৃতদেহ সৎকারের জন্যে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এবং মুষলধারে বৃষ্টি। চারিদিক ছেয়ে গেল ঘন অন্ধকারে। সেই ভীষণ দুর্যোগে শবযাত্রীরা দিশাহারা। কাছাকাছি কোন আশ্রয়ও ছিল না। মৃতদেহ শ্মশানে রেখে প্রায় আধমাইল দূরে একটা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিল শবযাত্রীরা। বৃষ্টি ও ঝড়ের দাপট কমে যাওয়ার পর তারা ফিরে এল শ্মশানে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, সেখানে শুধু শূন্য খাটখানা পড়ে আছে। তাহলে মৃতদেহ কোথায় গেল? কে অপসারিত করল?

এই আশ্চর্য সংবাদ যখন বিভাবতীকে দেওয়া হল তখন তিনি হতবাক। চিন্তার অকুল সাগরে পাড়ি দিচ্ছেন তিনি। কোথায় গেল কুমারের মৃতদেহ? যাই হোক, পরের দিন সকালে চাদর দিয়ে ঢাকা অবস্থায় একটি মৃতদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়।

এই ঘটনার বারো বছর পরে শুরু হল এক নতুন নাটক যা সত্যের চেয়ে বেশি সত্য। জীবনের চেয়ে বড়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সত্য কোনদিন চাপা থাকে না। সমস্ত মিথ্যাচার আর কুহেলিকা ভেদ করে যুগে যুগে সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। ভাওয়াল জমিদারীর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে একদিন সন্দেহ আর অবিশ্বাস আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল। মুখে মুখে কথা আর কাহিনী শোনা গেল ভাওয়ালের মেজ কুমারের মৃত্যু একটা মিথ্যা সংবাদ মাত্র। তিনি তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করছেন। তিনি জীবিত। এই খবর রটনা হওয়ার পর রাজপরিবার বহু লোককে নিযুক্ত করল কুমারের সন্ধানের জন্যে। কে এই মিথ্যা পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কিন্তু অনেক খোঁজ করেও তেমন কোন লোকের সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর হঠাৎ একদিন আবির্ভাব হল এক সন্ন্যাসীর। বুড়ি গঙ্গার তীরে বাকল্যাণ্ড বাঁধের ওপরে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। জটাজুটধারী অপরূপ সৌম্যদর্শন এক সাধু। সামনে তার প্রজ্বলিত চুল্লী। গম্ভীর নির্বাক ধ্যানমগ্ন। সেই নয়নশোভন সন্ন্যাসীকে দেখার জন্যে নগর ও গ্রামের প্রান্তদেশ থেকে হাজার হাজার লোক ছুটে এল। তারা

বিস্ময়ে বিমূঢ়। সকলের মুখে একটাই কথা। এ যে আমাদের মেজ রাজা! আমাদের রাজা। সন্ন্যাসী রাজা।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাওয়ালরাজ জমিদারির অসংখ্য কর্মচারী তাদের হারানো কুমারকে দেখার জন্যে সেখানে ভীড় করতে লাগল। গঙ্গাতীরের আসন ছেড়ে সন্ন্যাসী ক্রমশ এগিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের সামনে একটা চত্বরে দাঁড়িয়ে বিশাল জনতার সামনে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, আমি মৃত নই। আমি জীবিত। আমি ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। সেদিন বিপুল জনতা তাকে সমর্থন করল এবং ভাওয়ালের মধ্যম কুমার হিসেবে তাকে স্বীকার করে নিল। এমনকি কুমারের পিতামহীর মনেও কোনরকম সন্দেহের অবকাশ রইল না।

সেই সময়ে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী বিভাবতী দেবী কলকাতায় তার ভাইয়ের কাছে ছিলেন। কুমারের আবির্ভাবের কথা জানিয়ে সত্যভামা তাকে খবর দিলেন সে যেন জয়দেবপুরে এসে কুমারের পরিচয় সম্বন্ধে নিজেকে নিঃসন্দেহ করে। কিন্তু রাণী বিভাবতী কলকাতা ছেড়ে এলেন না। চিঠি দিয়ে জানালেন যে, ওই সন্ন্যাসী জাল কুমার রূপে নিজেকে পরিচিত করার চেষ্টা করছে এবং সেই জাল কুমারকে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই।

এই দীর্ঘ বারো বছর সময়ের মধ্যে ভাওয়ালের বড় কুমার রণেন্দ্র-নারায়ণ ও ছোট কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ দুজনেই মারা গেছেন। তাদের কারোরই কোন সন্তান ছিল না। যার ফলে, তাদের সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্এর হাতে চলে যায়। বড় কুমারের স্ত্রী সরযূবালা সন্ন্যাসীকে দেখে তাকে ভাওয়ালের মেজ কুমার বলে মেনে নিয়েছিলেন। প্রজাদের মধ্যেও অধিকাংশ তাকে প্রিয় মেজকুমার বলে বরণ করে নিয়েছিল। বহু প্রজা তাকে খাজনা ও রাজস্ব দিতে শুরু করল। এই সব দেখে শুনে রাণী বিভাবতী প্রবল আপত্তি তুললেন এবং সরকারের কাছে তীব্র ভাষায় লিখিত প্রতিবাদ জানালেন। তার ফলে উনিশশো একুশ সালের জুন মাসের তিন তারিখে ঢাকার কালেক্টর জে. এইচ্. লিণ্ডসে একটি নোটিশ জারি করলেন। সেই নোটিশে বলা হল, সন্ন্যাসী

বেশধারী কুমার একজন জাল লোক। কোন প্রজা তাকে যেন কোনরকম খাজনা বা রাজস্ব না দেয়। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে ওঠে উনিশশো ছাব্বিশ সালের আটই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার বোর্ড অফ্ রেভেনিউএর কাছে তার বিরুদ্ধে কুমার সমস্ত নোটিশ প্রত্যাহারের আবেদন জানালেন। শুনানীর পর উনিশশো সাতাশ সালের তিরিশে জুন তারিখে বোর্ড তার আবেদন অগ্রাহ্য করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এই রকম আদেশও জারি করা হল যে, জয়দেবপুরে কুমারের প্রবেশ নিষিদ্ধ কারণ সেখানে তার অবস্থিতি শান্তিভঙ্গের কারণ হতে পারে।

নিরুপায় হয়ে সন্ন্যাসী রাজা উনিশশো তিরিশ সালের চব্বিশে এপ্রিল তারিখে ঢাকার সাবজজের কাছে মামলা দায়ের করলেন। মামলার বিষয়বস্তু ছিল ভাওয়ালের মেজ রাজকুমার হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দান এবং রাজ এস্টেটে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রশ্ন। সেই সময়ে তিন রাজকুমারের সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্এর অধীনে ছিল। কুমারের মামলা পৃথিবীর অন্যতম নজিরবিহীন মামলা। সে এক শ্বাসরোধকারী নাটক। কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের বক্তব্য ছিল, সে এক কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের শিকার। তার দেহে তার স্ত্রী বিভাবতী আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করিয়েছিল যার ফলে সে জ্ঞান হারিয়েছিল এবং কিছুক্ষণের জন্যে তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি জেনেছেন, শ্মশানে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির রাতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে তার শ্বাসক্রিয়া আবার শুরু হয় এবং অত্যন্ত মৃদু স্বরে তিনি কাতরোক্তি করতে থাকেন। তার দেহ যারা এনেছিল তারা কেউ তখন সেখানে ছিল না। শ্মশানে একদল নাগা সন্ন্যাসী অবাক হয়ে দেখে যে, দাহ করার জন্যে আনা পরিত্যক্ত একটি শবদেহে জীবনের স্পন্দন। কাছাকাছি একটা গুহায় ওই সন্ন্যাসীদের আস্তানা ছিল। একটা লণ্ঠন নিয়ে সন্ন্যাসীর দল কুমারের দেহটা খাট থেকে তুলে নিয়ে গুহার মধ্যে নিয়ে যায়। হিমশীতল দেহটার চারিদিকে আগুন জ্বেলে ওরা উত্তাপের আয়োজন করে। অসুস্থ কুমারকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে ওদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কয়েকদিন পরে কুমারের জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু তখন তিনি স্মৃতিভ্রষ্ট। নাগা সন্ন্যাসীরা কুমারের মাথা কামিয়ে তাকে

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করায়। এই নাগা সন্ন্যাসীর দল ছিল চরিত্রে ভবঘুরে এবং যাযাবর। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছিল ওদের বিচরণ ক্ষেত্র। দার্জিলিংএর আস্তানা থেকে বেরিয়ে কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ওরা দূরান্তরে চলে যায়। আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের ফলে তার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। আগের জীবনের সমস্ত ঘটনা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। একটানা বারো বছর সন্ন্যাস জীবন যাপন করে তাদের সঙ্গে তিনি বহু তীর্থযাত্রার শরিক হন। সন্ন্যাসী কুমারের মামলায় বড় রাণী সরযূবালা দেবীকে দ্বিতীয় প্রতিবাদী হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল। তিনি কুমারের দাবী সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন। চরম বিরোধিতা করেছিলেন রাণী বিভাবতী দেবী। বিভাবতী তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন, উনিশশো ন' সালের মে মাসের আট তারিখে মধ্যরাত্রে কুমারের মৃত্যু হয়। রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুমারের মৃতদেহ স্টেপ অ্যাসাইড হোটেলে রাখা হয় এবং পরদিন সকালে শোভাযাত্রা সহকারে মৃতদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে দাহ করা হয়। কুমারের মৃত্যু ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কোন মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনা।

দীর্ঘ শুনানীর পর উনিশশো ছত্রিশ সালে এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। ভাওয়ালের মেজ কুমার জীবিত। বাদী স্বয়ং কুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ রায়।

ঢাকা জেলা-জজের রায়ের বিরুদ্ধে বিভাবতী দেবী আপীল করলেন কলকাতা হাইকোর্টে উনিশশো ছত্রিশ সালের পাঁচ অক্টোবর তারিখে। রাণীর পক্ষে হাজির হয়েছিলেন আইনজীবি এ. এন. চৌধুরী, ফণীভূষণ চক্রবর্তী, পঙ্কজ ঘোষ, সঞ্জীব চৌধুরী ও প্রশান্ত বিহারী মুখার্জি। কুমারের পক্ষে হাজির হয়েছিলেন বি. সি. চ্যাটার্জি, বঙ্কিম মুখার্জি, অতুল গুপ্ত এবং মুক্তিপদ চ্যাটার্জি। আজ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে যত মামলার শুনানী হয়েছে ভাওয়াল মামলা বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ। সারা ভারতে এই মামলা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত দেশের সীমানা ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছিল সাগরপারে। এই বৃহৎ মামলায় নিম্ন আদালতে দেড় হাজারেরও বেশি লোকের সাক্ষ্য

প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সাক্ষীর সেই বিরাট তালিকায় ছিল বিখ্যাত হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ, বহু সংখ্যক নামী চিকিৎসক, ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট, অধ্যাপক, জমিদার, প্রজা, তেজারতি কারবারী, নাগা সন্ন্যাসী, রাজ এস্টেটের কর্মচারী, এমনকি কিছু সংখ্যক বারবণিতা।

হাইকোর্টে এই মামলার আপীলের শুনানী শুরু হয় উনিশশো আটত্রিশ সালের চোদ্দই নভেম্বর তারিখে। প্রায় এক বছর ধরে শুনানী চলে। দীর্ঘদিন বিচার বিবেচনার পর উনিশশো চল্লিশ সালের পঁচিশে নভেম্বর তারিখে মামলার ফলাফল জানানো হয়। এই আপীলের জন্যে যে বিশেষ এজলাস গঠন করা হয় তাতে বিচারপতি ছিলেন কস্টেলো, চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও রোনাল্ড ফ্রান্সিস লজ। বিচারপতি লজ ও চারুচন্দ্র বিশ্বাস কুমারকে সমর্থন করেন ও তার অনুকূলে রায় দেন। হাইকোর্টে শোচনীয় পরাজয়ের পর রাণী বিভাবতী বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করলেন। সেখানে প্রায় একমাস ধরে শুনানী চলল তিনজন বিচারপতির বেঞ্চে। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারেও রাণী হেরে গেলেন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এই ঐতিহাসিক মামলা জিতেও কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ সেই জয়ের ফল ভোগ করতে পারেন নি। রায় বের হওয়ার অল্পদিন পরেই কুমারের মৃত্যু হয়।

নাটকের কপিরাইট নিয়ে

আঠারশো একানব্বই সাল। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারের তখন জমজমাট অবস্থা। মালিক অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগী। গিরিশ ঘোষ সেখানে নাট্যরচয়িতা, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। তখনকার কলকাতায় নাট্যকার বলতে গিরিশ ঘোষই সবার ওপরে। গিরিশ ঘোষ স্টার থিয়েটারের জন্যে প্রায় দশখানি নাটক লেখেন। পারিশ্রমিক পান দশ হাজার টাকা। তাঁর লেখা বিল্বমঙ্গল নাটক প্রথম অভিনীত হয় আঠারশো ছিয়াশি সালে, বুদ্ধদেব চরিত আঠারশো পঁচাশি সালে, মলিনা বিকাশ ও বেল্লিক বাজার তার কয়েক বছর পরে। এ ছাড়া তিনি আরও পাঁচখানি নাটক লিখেছিলেন এবং পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন ছ হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা। গিরিশের নাটক ছাড়া স্টারে আরও দুটো নাটক চলত। একটি বিবাহ বিভ্রাট ও অপরটি বেল্লিক বাজার। এ দুটো নাটক রচনা করেছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু।

সে যুগে অন্যান্য সাধারণ রঙ্গালয়ে গিরিশ ঘোষের নাটক নিয়ে

কাড়াকাড়ির অন্ত ছিল না। অনেকেই তাঁর নাটক চালাতে উৎসাহী। কিন্তু স্টার অন্য কোথাও গিরিশের নাটক অভিনয়ে নারাজ। এই ব্যাপার নিয়ে স্টারের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হল। তিনি স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এল অপর এক অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তী। রাতারাতি গিরিশ ঘোষ একটা দল গড়ে ফেললেন। বেশ কিছু নট নটী তাঁর দলে যোগ দিল। ভূমিকা বণ্টন করে তাদের সকলকে তৈরী করে নিলেন তিনি। চোরবাগানে কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে বিল্বমঙ্গল ও বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় করলেন। তারপর বাগবাজারে নন্দলাল বসু ও পশুপতি বসুর বাড়িতে বুদ্ধদেব চরিত, মলিনা বিকাশ ও তাজ্জব ব্যাপার অভিনয় করলেন। ঘরোয়া পরিবেশে গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখার জন্যে কলকাতার অভিজাত সমাজ সপরিবারে হাজির হয়েছিলেন। নটগুরুর এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে স্টার থিয়েটার রাগে অগ্নিশর্মা। মালিকরা ছুটলেন অ্যাটর্নির কাছে। অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, কোন এগ্রিমেণ্ট আছে? ওরা বললেন, আছে! গিরিশের সই করা চুক্তিপত্র দেখালেন। গিরিশ ঘোষ স্টার থিয়েটারের জন্যে নাটক লিখবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সেসব নাটক ছাপা যাবে না এবং অভিনয়ের স্বত্ব একমাত্র তাদেরই থাকবে।

সব শুনে গণেশচন্দ্র গিরিশ ঘোষকে নোটিশ দিলেন যে, এই সব নাটক পরিবেশন থেকে এখনি তিনি যদি বিরত না হন তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। গিরিশ ঘোষ জানতেন না ভয় কাকে বলে। সেই চিঠির জবাবে গিরিশের অ্যাটর্নি প্রিয়নাথ বসু বললেন, তাঁর মক্কেল এই হুমকিতে যারপরনাই অবাক হয়েছেন। চিঠিতে যেসব নাটকের কথা বলা হয়েছে সেগুলোতে স্টার থিয়েটারের কোন কপিরাইটের প্রশ্ন আসে না। গিরিশ ঘোষের নিজের লেখা নাটকের সর্বস্বত্ব তাঁরই। বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব চরিত, বেল্লিক বাজার ও মলিনা বিকাশ নাটকে স্টারের একচেটিয়া অধিকার থাকতে পারে না।

ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকে নি। দুপক্ষের অনমনীয় মনোভাবে শেষ পর্যন্ত ঝগড়া আদালত পর্যন্ত পৌঁছাল। স্টার থিয়েটার গিরিশ

ঘোষ ও নীলমাধবের নামে হাইকোর্টে মামলা করে দিল। অভিযোগ, যে সব নাটকে স্টার থিয়েটারের একচেটিয়া অধিকার, সে সব নাটক তিনি তাদের অনুমতি ছাড়াই অভিনয় করছেন। হাইকোর্ট গিরিশ ঘোষের নামে একটা অন্তবর্তী নিষেধাজ্ঞা জারী করল। এই সঙ্গে স্টার আরও একটি মামলা শুরু করল। স্টারের অপর অভিনেতা প্রবোধ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সিটি থিয়েটার নামে একটা নাট্যদল গড়ে কলকাতার বীণা থিয়েটারে স্টারের স্বত্বাধীন নাটক অভিনয় করে চলেছেন। বীণা থিয়েটারে প্রবোধ ঘোষ সরলা, চৈতন্যলীলা ও তাজ্জব ব্যাপার নাটক পরিবেশন করেছেন। এ সব অভিনয়ের কথা স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা ও ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। হাইকোর্ট থেকে আবার নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। বিল্বমঙ্গল, বিবাহ-বিভ্রাট, তাজ্জব ব্যাপার, বুদ্ধদেব চরিত, মলিনা বিকাশ, বেল্লিক বাজর ও চৈতন্যলীলা নাটক স্টার ছাড়া অন্য মঞ্চে অভিনয় করা চলবে না।

গিরিশ ঘোষ বিপদে পড়লেন। তাছাড়া তাঁর সম্মানের প্রশ্নও আছে। গিরিশ ঘোষ রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, সরলা নাটকটি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা স্বর্ণলতা উপন্যাস অবলম্বনে অমৃতলাল বসু ও নীলমাধব চক্রবর্তীর দ্বারা যৌথভাবে নাট্যরূপায়িত হয়। তারকনাথের অনুমতি ছাড়াই সে নাটক স্টারে অভিনীত হয়েছিল। সিটি থিয়েটারে সরলা নাটক খোলা হয়েছে ঠিকই। তবে নতুন আঙ্গিকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। পুরানো সরলার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। গিরিশ ঘোষ আরও বললেন, তাঁর লেখা নাটক অন্য কোন সাধারণ থিয়েটারে হচ্ছে না। তাঁর নাটক সম্পর্কে স্টারের মালিকানার কোন প্রশ্ন ওঠে না। নিজের নাটক নিজে করতে পারবে না এমন কোন চুক্তি তিনি করেন নি।

বিচারপতি উইলসনের এজলাসে মামলা উঠল। গিরিশের নাটকের অভিনয় স্বত্ব নিয়ে বড় রকমের টানাটানি চলল। দু'পক্ষের সওয়াল জবাব যেন আর একটা নতুন নাটকের বিশেষ দৃশ্য। সব শুনে বিচারপতি উইলসন বললেন, গিরিশ ঘোষের লেখা নাটকে এবং

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতার ওপর স্টার থিয়েটারের কোন কপিরাইট নেই। আঠারশো একানব্বই সালের এগারই আগস্ট তিনি মামলাটি খারিজ করে দেন। খরচের সব ভার চাপে স্টারের মালিকদের ওপর। বিজয়ী গিরিশ ঘোষ বেরিয়ে এলেন আদালত থেকে।

গিরিশ ঘোষ উইল করেছিলেন

বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করেন উনিশশো বারো সালের নয় ফেব্রুয়ারী। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি দুরারোগ্য হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন। জীবনের দীপ নিভে আসছে ভেবে মৃত্যুর প্রায় আট বছর আগে উনিশশো চার সালের জুন মাসের কুড়ি তারিখে তিনি তাঁর শেষ উইল বা চরমপত্র সম্পাদন করেন। তাঁর সেই চরম ইচ্ছাপত্রে সাক্ষী ছিলেন বোসপাড়া লেনের বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, শিবশঙ্কর মল্লিক লেনের নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক এবং রামকান্ত বোস লেনের শৈলেশ্বর ঘোষ।

গিরিশচন্দ্র তাঁর সহোদর ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। ভাইদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তখন জীবিত ছিলেন। তখনও পরিবার ছিল একান্নবর্তী। অতুলকৃষ্ণ হাইকোর্টে ওকালতি করতেন।

গিরিশচন্দ্রের বাবা নীলকমল ঘোষ সেকালের কলকাতার একজন অভিজাত লোক ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি বেশ কিছু সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র জীবনে অর্থ পেয়েছিলেন প্রচুর। সম্মান পেয়েছিলেন প্রচুরতর। কিন্তু শান্তি তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল না। পর পর দুই স্ত্রীর অকাল বিয়োগ, সন্তানের লোকান্তর তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। একমাত্র কুলপ্রদীপ দানীকে নিয়েও ছিল তাঁর আমরণ অশান্তি। নটগুরুর উইলে তাঁর মনোবেদনা প্রকট হয়ে উঠেছে। একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যিনি সাধারণের কাছে দানীবাবু বলে সমধিক

পরিচিত তাকে তিনি সম্পত্তির ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি উইলে বলেছেন, আমার একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে দানী। পেশায় সে অভিনেতা। আমি জানি সে অবিবাহিত। আমার সম্পত্তি দান করার ব্যাপারে আমি তাকে যোগ্য বলে মনে করি না। সেই কারণে আমি আমার একজিকিউটরকে নির্দেশ দিচ্ছি সে যেন আমার সম্পত্তির আয় থেকে দানীর যোগ্য ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে। ভরণ-পোষণের টাকা এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে একজি-কিউটরের মতামতই চূড়ান্ত। যদি দানী পূর্ণ সামাজিক প্রথায় এবং হিন্দুমতে বিবাহ করা স্থির করে তাহলে একজিকিউটর তার ভরণ-পোষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবে।

ব্যক্তিগত জীবনে গিরিশচন্দ্র পরম ভক্ত ছিলেন। তের নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তিনি শ্রীধরজিউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তির আয় থেকে দেবসেবার যথারীতি নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ছেলের ওপর আস্থা হারিয়ে-ছিলেন একথা ঠিক। কিন্তু উইল করার সময়ে বার বার তিনি সেই অবাধ্য ছেলের কথা ভেবেছিলেন। উইলে তিনি লিখেছিলেন, যদি কোন কারণে বসতবাড়ি বিক্রি করতে হয় তাহলে একজিকিউটর অতুলকৃষ্ণ যতশীঘ্র সম্ভব দানীর জন্যে অবশ্যই অন্য কোন স্থায়ী বাস-স্থানের বন্দোবস্ত করবে। ঘোষ বংশের ঠাকুর শ্রীধরজীউও সেই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর বোন দক্ষিণাকালীর জন্যে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আমৃত্যু বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। এগার নম্বর রামকান্ত বোস সেকণ্ড লেনের বাড়ির অংশ তিনি দুই দৌহিত্র দুর্গা প্রসন্ন ও ভগবতী প্রসন্ন বসুকে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা গিরিশ গ্রন্থাবলীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কপিরাইটও তিনি ওই দুই নাবালককে দান করেন। বাকি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাঁর ভাই অতুলকৃষ্ণকে জীবনসত্বে দান করেন। অতুলকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবেন দানীবাবু।

গিরিশ ঘোষের ভাই অতুলকৃষ্ণ মারা যান উনিশশো ষোল সালের

নয় নভেম্বর তারিখে। তিনি কোন উইল করেন নি। একমাত্র দানীবাবুই ছিলেন তাঁর আইনসম্মত উত্তরাধিকারী। অতুলকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর ও গিরিশ ঘোষের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন দানীবাবু। গিরিশ ঘোষ যে দানীবাবুর ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি সেই দুঃখ বোধ হয় তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির কোনই ক্ষতিসাধন করেন নি। দানীবাবুর মৃত্যুর সময়ে তাঁর সম্পত্তির দাম ছিল নব্বই হাজার টাকা। দানীবাবু তাঁর সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার জন্যে উনিশশো ছাব্বিশ সালের একুশে মার্চ তারিখে উইল করেছিলেন। ইহলোক ত্যাগ করেন উনিশশো বত্রিশ সালের আটাশে নভেম্বর তারিখে। সে যুগের অপরাজেয় অভিনেতা দানীবাবু যশের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বোধ হয় খুব দুঃখী ছিলেন। উইলে তিনি বলেছেন, সামাজিক মতে বিবাহ বলতে যা বোঝায় তেমন বিবাহ তিনি করেননি। তবু তাঁর দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী অমৃতমণি দাসী স্ত্রীর চেয়েও বেশি। দানী-বাবুর জীবদ্দশায় অমৃতমণি অকালে মারা যান। ব্যক্তিজীবনে দানী-বাবুও একজন পরম ভক্ত ছিলেন। পিতৃপ্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউ, পরম পুরুষ রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি ও নিজের গুরুদেব শ্রীঅবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীর প্রতিকৃতির নিত্যপূজার ব্যবস্থা তিনি তাঁর উইলে করে গেছেন। ছেলে পূর্ণচন্দ্র, মেয়ে লবঙ্গলতা এবং কোন এক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে তিনি তাঁর উইলের একজিকিউটর ও ঠাকুরের সেবাইত নিযুক্ত করেন। তের নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ি তিনি ঠাকুরের নামে দান করেন। চোদ্দ নম্বর নিবেদিতা লেনের একটি বাড়ি তিনি ছেলে ও মেয়েকে দিয়ে যান। এ ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তি, বিভিন্ন কোম্পানীর বহু শেয়ার সমগ্র গিরিশ গ্রন্থাবলী ও গিরিশচন্দ্র রচিত প্রায় একাত্তর খানি বই-এর স্বত্ব তিনি ছেলে ও মেয়েকে দিয়ে গেছেন। এ ছাড়া দানীবাবু তাঁর শ্যালককে এক হাজার টাকা দিয়েছেন। গিরিশজীবনী রচয়িতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এক হাজার টাকা দিয়েছেন। গুরুদেব শ্রীঅবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীর মঠে তিনি দুহাজার টাকা দান করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

লং সাহেবের ঐতিহাসিক বিচার

আঠারশো একষট্টি সালের উনিশে জুলাই। কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েলস্-এর এজলাস লোকে লোকারণ্য। এক শান্তিদূত সংসারত্যাগী ধর্মযাজক দায়রায় সোপর্দ। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর অভিযোগ। অভিযুক্ত লোকটির নাম রেভারেণ্ড জেমস্ লং।

রেভারেণ্ড লং মিশনারী হিসাবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন আঠারশো চল্লিশ সালে। তাঁর শৈশব কেটেছিল রাশিয়ায়। ভারতে তাঁর কর্মস্থল ছিল বাংলা দেশ। গ্রামে গ্রামে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজে গিয়ে তিনি এই সুজলা সুফলা দেশটাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তিনি ভাল-বেসেছিলেন বাংলার দরিদ্র কৃষকদের। তিনি ছিলেন মানবতার পূজারী। পথে পথে লোকসঙ্গীত গেয়ে তিনি প্রচার করতেন সাম্য

মৈত্রী ও প্রীতি। নানা ধরনের বাংলা পল্লীগীতি সংগ্রহ করে তিনি গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গেয়ে বেড়াতেন। তাঁর সেই সব গানের উপজীব্য ছিল নীলের চাষে নিযুক্ত গরীব কৃষক-জীবনের কথা ও কাহিনী।

রেভারেণ্ড লং-এর বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনা হয় তখন সারা ভারত ছিল এক বিক্ষোভের সুরে বাঁধা। সিপাহী বিদ্রোহের পর তখন সবেমাত্র চারটি বছর পার হয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন ভারতের শাসনভার। সেই যুগসন্ধিক্ষণে জেগে উঠেছিল কৃষক অসন্তোষ। নীল চাষের পটভূমিকায় রায়তদের ওপর অত্যাচারে বাংলা দেশে উঠেছিল একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড়। ঠিক সেই সময়ে বাংলা দেশের এক দরদী কথাশিল্পী গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখতে পেলেন সেই বিপ্লবের অন্তরে চাপা অসন্তোষের আগুন। দেখলেন নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার। দেখলেন গরীব চাষীদের প্রতিকারহীন সহনশীলতা। সেই উৎপীড়নের পটভূমিতে তিনি লিখলেন একখানি নাটক। নাম দিলেন 'নীলদর্পণ'। তিনিই প্রথম বিপ্লবী প্রথম বিদ্রোহী যিনি লেখনীর মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ বণিকের ছবি এঁকেছিলেন নাটকের মধ্যে। সেই জনদরদী নাট্যকারের নাম দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু সেদিন তিনি পাঠকের কাছে নিজের নাম প্রকাশ করেননি।

আঠারশো একষট্টি সালের মাঝামাঝি 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করলেন রেভারেণ্ড লং। তাতে নাট্যকারের নাম ছিল না। অনুবাদকেরও নাম ছিল না। যদিও কিছুদিনের মধ্যে লোকমুখে প্রচারিত হয়েছিল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন। অবশ্য ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকের প্রচ্ছদে লেখা ছিল নাটকটি কোন দেশীয় লোকের দ্বারা ভাষান্তরিত। 'নীলদর্পণ'এর ইংরাজি অনুবাদ 'ইনডিগো প্লাণ্টার্স মিরর' ছাপা হয়েছিল কলকাতার দশ নম্বর ওয়েস্টন লেনে ক্যালকাটা প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং প্রেসে। নাটকটির মুদ্রাকর ছিলেন জনৈক সি. এইচ. ম্যানুয়েল। বই ছাপা হয়েছিল মাত্র পাঁচশো কপি। তার মধ্যে দুশো দু' খানি বই তিনি

ভারত ও ভারতের বাইরে অভিজাত ইংরেজদের বিলিয়েছিলেন। বইখানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলকর সাহেবরা ক্ষেপে উঠলেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতটাও একটু নড়ে উঠেছিল। নীল চাষের নামে অত্যাচারের সুতীব্র সমালোচনা শ্বেতাঙ্গ বণিকরা সহ্য করতে পারলেন না। শাসক মহলে বইখানি নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় উঠল। সন্ধান চলতে লাগল নাট্যকার কে ? কে-ই বা এই নাটক অনুবাদ করেছে ? কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নাট্যকার বা অনুবাদকের নাম জানা গেল না।

কলকাতার বিদগ্ধজন অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানালেন প্রকাশক লংকে। কয়েকজন গণ্যমান্য লোক চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা জানালেন তাঁকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর ও আরও তেতাল্লিশ জন সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁরা লিখেছিলেন 'নীলদর্পণ'এর অনুবাদ প্রকাশ করে লং সাহেব একটি মহৎ কাজ করেছেন। দেশীয় কৃষকদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারকে এবং কৃষকদের মনোবেদনাকে তিনি যথাস্থানে তুলে ধরেছেন। সেই চিঠি পেয়ে শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় লং সাহেবের মন ভরে উঠেছিল। চিঠির উত্তরে পনেরই জুলাই তারিখে তিনি লিখলেন ঃ

এই দেশে মিশনারী হিসাবে কাজ করতে এসে আমি দেখেছি এখানকার কৃষকদের ওপর বর্বর অত্যাচার ও উৎপীড়ন। আমার দেশের মানুষের ওপর যে শ্রদ্ধা আমার মনে আছে তা বজায় রাখার জন্যেই আমি এই অনুবাদ প্রকাশ করেছি। আমার ধর্ম মানুষকে ভগবানের নির্দিষ্ট পথে চালিত করে। এই অনুবাদ প্রকাশের মাঝে আমি আমার স্বজাতিদের বোঝাতে চেয়েছি কোন্ পথ ঠিক আর কোন্ পথ ভুল। এই কাজে নামার জন্যে হয়ত আমাকে নির্যাতন ভোগ করতে হবে। তবু আমি জানব, যে সব নির্যাতিতের কথা আমি প্রকাশ করেছি, তাদের চেয়ে আমার দুঃখভোগ কোন অংশেই বেশি হবে না।

তদানীন্তন সরকার লংএর এই অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারটা ক্ষমার

চোখে দেখে নি। তারা জানত ভারতের মাটিতে সোনা ফলে। সে দেশের মাটির মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুললে শাসন ব্যবস্থা আর বাণিজ্য হবে বানচাল। তাছাড়া যে বইতে ইউরোপীয় বণিকদের তিক্ত সমালোচনা করা হয়েছে, সেই বই-এর অনুবাদ প্রকাশ করে রেভারেণ্ড লং কি স্বজাতির প্রতি শত্রুতা করেন নি? কেন তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হবেন না?

দায়রায় সোপর্দ করা হল রেভারেণ্ড জেম্‌স লংকে। পনের জন জুরীর সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন তিনি। আঠারশো একষট্টি সালের জুলাই মাসের উনিশ, কুড়ি ও চব্বিশ এই তিন দিন বিচার চলেছিল। এজলাসে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। লংএর বিচারই কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের শেষ ঐতিহাসিক বিচার। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এবং কলকাতাবাসী আদালতে ভীড় করেছিলেন সেই বিচার দেখতে। লংএর বিপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যাও বিশেষ কম ছিল না। সরকার পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন মিস্টার পিটারসন ও মিস্টার কাউই। লংএর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন মিস্টার এগলিনটন ও মিস্টার নিউ মার্চ। তিনজন বিশিষ্ট ইংরেজ লংএর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা হলেন গভর্ণর জে. পি. গ্র্যাণ্ট, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সেটন্‌-কার ও ম্যাজিস্ট্রেট এডেন।

শুনানীর সময়ে বিচারক ওয়েল্‌স বার বার লংকে প্রশ্ন করেছিলেন কে এই নাটকের রচয়িতা? অনুবাদ করেছে কে? কিন্তু লং সে প্রশ্নের কোন জবাব দেননি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন আইনের চোখে এই বই প্রকাশের জন্যে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে সব শাস্তি তিনি নিজেই মাথা পেতে নেবেন। দায়রা আদালতে আসামীর বিবৃতির কোন দাম নেই। তবু শুনানীর শেষে বিচারপতি তাঁকে বিবৃতি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। লং বললেন, দায়রায় সোপর্দ হয়ে আসামীর ভূমিকায় আজ আমি আদালতে উপস্থিত। আইন অনুযায়ী আমার কোন বক্তব্য পেশ করার অধিকার ছিল না। ধর্মাবতারের এই মহানুভবতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি জানি এই বিচারের রায় যখন বের হবে তখন তা শুধু কলকাতা বা ভারতের

ভৌগলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত দেশেও তা পৌঁছে যাবে। সেই কারণে আমি বলতে চাই কেন আমি এই নাটকের প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছিলাম।

বিশ বছর কেটে গেছে আমি ভারতবর্ষে এসেছি। এই সময়ের মধ্যে আমি কোনদিন বাদী বা প্রতিবাদী হিসাবে বিচারালয়ে আসিনি। আমার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। আমার সময় কেটেছে এদেশের লোকের কাছে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে এবং ভারতীয়দের শিক্ষা বিস্তারের কাজে। কাজের জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আমি দেখেছি নীলচাষের নামে এদেশের চাষীদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন। সেই কথাই আমি 'নীলদর্পণ' এর অনুবাদের ভেতর দিয়ে জানাতে চেয়েছিলাম প্রভাবশালী ইংরেজদের কাছে। 'নীলদর্পণ' এ আমি নারীত্বের অবমাননা করেছি বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে আমি তার প্রতিবাদ করছি। আমি বিশ্বাস করি ভারতের কৃষক রমণীরা সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় কোন অভিজাত ইউরোপীয় নারীর চেয়ে কম নয়। তাছাড়া নীলকরদের কোন রকম হেয় করার চেষ্টা আমি করিনি।

কথা বলতে বলতে রেভারেণ্ড লংএর গলা ধরে এসেছিল। আবেগে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি বলে চললেন, আমি পেশায় ধর্মযাজক, আমি শান্তির দূত, যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি। সিপাহী বিদ্রোহের পর কলকাতা রুদ্ধ নিশ্বাসে মাত্র চারটি বছর কাটিয়েছে। সেই বিদ্রোহের অবসান হলেও বিক্ষোভের বীজ এখনও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ভারতের ভবিষ্যতে কী আছে কে জানে! ধর্মযাজক হিসাবে আমি আমার স্বদেশবাসীর বন্ধু হিসাবেই কাজ করে চলেছি। একজন মিশনারী হিসাবে আমি এইটাই বিশ্বাস করি যে শাসক যদি শাসিতের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়, তাহলে শান্তি কিছুতেই সম্ভব নয়। সাহসের সঙ্গে লং বললেন, একজন শান্তিকামী মিশনারী হিসাবে আমার স্বদেশের লোকের ভুল ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব আমার আছে বলে মনে করি। এদেশের লোকের সঙ্গে মিশে আমি গর্বিত। তাদের দুঃখ দৈন্য আমার চেতনাকে নাড়া দিয়েছে। তাই আমি 'নীলদর্পণ' এর অনুবাদ প্রকাশ করেছি।

লং তাঁর বলা শেষ করার পরেও কথাগুলো যেন আদালতের চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এতখানি শোনার জন্যে বোধ হয় বিচারকও প্রস্তুত ছিলেন না। বিচারপতি জুরীদের চার্জ বোঝালেন। তার মূল কথা হল, আসামী যদি 'নীলদর্পণ' এর অনুবাদ সমাজের উপকারের জন্যে প্রকাশ করত বা সেই উদ্দেশ্যে বিতরণ করত, যদি এই বই ভারতে নীলচাষের বিষয়ে কোন সংস্কারের ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আসামীর কোন অপরাধ হয় নি। কিন্তু যদি দেখা যায় আসামী নীলকরদের ওপর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে এই বই প্রকাশ করেছে, যদি বোঝা যায় একটি অভিজাত ব্যবসায়া সম্প্রদায়কে সে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন কবার চেষ্টা করেছে তাহলে নিঃসন্দেহে তার অপরাধ গুরুতর।

চার্জ শুনে জুরীরা রেভারেণ্ড লংকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। উপস্থিত লোকজন তখন হতবাক। সারা আদালতে ভাষণ উত্তেজনা। বিচারপতি লংকে বললেন, যাজক হিসাবে তোমার অপরাধ সাধারণ লোকের চেয়ে নিন্দনীয়। আদালতে তুমি বলেছ বহু ইংরেজের অধর্মীয় আচরণ তোমার খৃষ্টধর্ম প্রচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার মত একজন লোকের পক্ষে এ রকম উক্তি অত্যন্ত অশোভন। তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে তুমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছ। বিচারপতি লংকে এক মাসের জেল দিলেন। থাকতে হবে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে এক হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানা না দিলে অতিরিক্ত এক মাসের জেল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ। জরিমানার এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেন তিনি। কলকাতার গণমান্য লোকেরা সরকারের কাছে আবেদন করার জন্যে তৈরি হলেন যাতে এই শাস্তির মেয়াদ আবার বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সে প্রস্তাবে লং রাজি হননি।

হাইকোর্ট দায়রায় উল্লাসকর

উনিশশো আট সাল। তখন বিপ্লব গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে। তিন বছর আগে বাংলা বিভাগের পর থেকেই বিক্ষোভ মোড় নিয়েছে হিংসার পথে। গ্রামে গঞ্জে শহরে গড়ে উঠেছে আখড়া আর সমিতি। ব্যায়ামচর্চার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে সংগ্রামের প্রস্তুতি। মেদিনীপুর উত্তাল। চন্দননগর অশান্ত। পুলিশের সাব ইনসপেক্টর পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস তখন দমন-পীড়নের ব্যাপারে বেশ নাম করেছেন। বিদেশী শাসকের সুনজরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা তার। চন্দননগরের বোমার মামলা এবং কুষ্টিয়ায় সরকারী অফিসার হত্যা মামলার তদন্ত করে তিনি তখন কলকাতায় ফিরেছেন। কলকাতায় ফিরে এখানকার হালচাল সম্বন্ধে তিনি খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। তারপর এক গোপন রিপোর্টে তিনি ওপরওয়ালাদের জানালেন, 'বন্দেমাতরম'

পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ একটা বিপ্লবীর দল গঠন করেছেন। তাদের কাজ গভর্ণমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের খুন করা। ওই উদ্দেশ্যে পনের নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেন এবং আটত্রিশের চার রাজা নবকিষেণ স্ট্রীটে ছোটখাট বোমার কারখানা তৈরি হয়েছে। সেই সব মারাত্মক বোমা মজুত করার জায়গাগুলোও তিনি খুঁজে বের করেছেন। সেগুলো হল গ্রে স্ট্রীটে 'নবশক্তি' অফিস, চার নম্বর হ্যারিসন রোডে এবং তেইশ নম্বর স্কট লেনে 'যুগান্তর' বইএর দোকান, তিরিশের দুই হ্যারিসন রোডে 'স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়' এবং একশো চৌত্রিশ নম্বর হ্যারিসন রোডে 'ভারত ভৈষজ্য ভাণ্ডার'। পূর্ণচন্দ্র আরও জানালেন, মাণিকতলা অঞ্চলে মুরারিপুকুরে অরবিন্দ ঘোষের বাগানেও বোমা রাখা হয়। ওখানেও বেশ কিছু লোক বোমা ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কাজে লিপ্ত আছে।

বৃটিশ সরকারের ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশন অফিসে এই রিপোর্ট পৌছানোর পর অফিসাররা সজাগ হয়ে উঠল। এই সব জায়গার ওপর কড়া নজর রাখা হল। বাড়িগুলোর আশপাশে ছদ্মবেশে পুলিশ ঘুরে বেড়াতে লাগল। খোঁজ খবর নিয়ে তিরিশে এপ্রিল তারিখে সূর্য ওঠার আগে অসংখ্য পুলিশ একশো চৌত্রিশ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়িটি ঘিরে ফেলল। সেদিনের এই তল্লাসীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুলিশ অফিসার মিস্টার বাউডেন ও মিস্টার হ্যামিলটন। অবশ্যই সঙ্গে ছিলেন বিভাগীয় সাব ইন্‌সপেকটর পূর্ণ চন্দ্র বিশ্বাস। সেই বাড়ির পশ্চিম দিকের একখানা ঘর থেকে লাঠি এবং বেয়নেটের খোঁচা মেরে দুজনকে জাগানো হল। তাদের নাম বিজয় রতন সেন ও মতিলাল বসু। তারপর পুলিশের দাপাদাপি চলল সারা বাড়িটায়। অন্যান্য ঘর থেকে খুঁজে বার করল আরও তিন জনকে। তারা হল অশোকচন্দ্র নন্দী, ধরণীধর সেনগুপ্ত ও নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কিন্তু গোপন রিপোর্ট অনুযায়ী যাকে ধরার জন্যে এই বিরাট অভিযান, সেই বিশেষ লোকটিকে পুলিশ খুঁজে পেল না। তার নাম উল্লাসকর দত্ত। ওদের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বাড়ি থেকে উদ্ধার করল একটা বিরাট স্টীল ট্রাঙ্ক। তাজা বোমায় সেটা ভরা ছিল।

কিন্তু দলের নেতা উল্লাসকর কোথায়? সারা কলকাতা জুড়ে বহু আস্তানায় পুলিশ হানা দিল। কয়েকদিন পরে গভীর রাতে চৌত্রিশ নম্বর মুরারি পুকুর রোডে অরবিন্দের বাগান থেকে উল্লাসকর দত্তকে গ্রেপ্তার করল। এই দুঃসাহসিক গ্রেপ্তারের কৃতিত্ব অর্জন করলেন পুলিশ ইনসপেকটর জে. এল. ফ্রিজোনি। মুরারিপুকুরের বাগান থেকে বহু আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা এবং অনেক বিস্ফোরক তিনি উদ্ধার ও আটক করলেন। বিচারের জন্যে উল্লাসকর ও আরও পাঁচজন রইলেন হাজতে। তারপর কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট টমাস থর্ণহিলের কাছে অভিযুক্তদের হাজির করা হল। পুলিশ অফিসার মিস্টার ব্ল্যাক, প্লাউডেন, করবিট্ ও হ্যালিডে সাক্ষ্য দিলেন। পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসও ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাক্ষী। প্রাথমিক শুনানীর পর আসামীদের বিরুদ্ধে থর্ণহিল অস্ত্র আইনের উনিশ ও কুড়ি ধারায় চার্জ গঠন করলেন। মামলাটি তিনি হাইকোর্টের দায়রা আদালতে পাঠিয়ে দিলেন।

হাইকোর্টে এই মামলায় উল্লাসকর দত্তর পক্ষে অ্যাটর্নি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ দত্ত। নগেন্দ্রনাথ ও ধরণীধর নিযুক্ত করেছিলেন ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষকে। অন্যান্যদের পক্ষে অ্যাটর্নি ছিলেন সুবোধ চন্দ্র মিত্র।

আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ প্রমাণ করার জন্যে পুলিশের তরফ থেকে বহু সাক্ষী হাজির করা হয়েছিল। একশো চৌত্রিশ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ির মালিক ছোটেলাল বললে, তার কর্মচারী চন্দ্রলালজী মহারাজ ওই বাড়ির ভাড়া আদায় করে থাকে। ভাড়াটিয়াদের কাজকর্ম বা গতিবিধি সম্পর্কে তার জানার কথা নয়। আগে বাড়িটার মাসিক ভাড়া ছিল বারো টাকা। পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় কুড়ি টাকা।

পুলিশ যখন একশো চৌত্রিশ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ি থেকে বোমাভরা ট্রাঙ্ক উদ্ধার করে তখন স্থানীয় কিছু লোক সার্চ লিস্টে সই দেয়। তাদের মধ্যে ছিল পুলিশ অফিসার হ্যালিডে, শেখ আবদুল্লা, ফকির মহম্মদ, কাফিয়ুল্লা ও আবদুল সুকু। উদ্ধারকরা বোমাগুলো সনাক্ত করার জন্যে সাক্ষী ডাকা হয়েছিল ফেনউইক-বাজার থানার সুপারিনটেনডেন্ট বাউডেন ও কয়েকজন কনস্টেবলকে। সরকারের

তরফ থেকে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ইনস্‌পেকটর ফ্র্যাঙ্ক স্মলউড বললেন, আটক করা বোমাগুলো আমি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেছি। সেগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় শক্তিশালী এবং অত্যন্ত মারাত্মক। রুশ জাপান যুদ্ধে এবং পেনিনসুলার যুদ্ধে বৃটিশ সেনারা হাতে তৈরি যে ধরণের বোমা ব্যবহার করেছিল এই বোমাগুলো সেই জাতের।

অন্য সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন পুলিশের সাব ইনসপেকটর সতীশ চন্দ্র ব্যানার্জি। তিনি বললেন, পুর্ণ চন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি গোপী মোহন দত্ত লেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সি. আই. ডি সুরেশ চন্দ্র ঘোষ তাদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে হেড কনস্টেবল বলাই গাঙ্গুলী অপেক্ষা করছিল। সতীশবাবু পনের নম্বর গোপী মোহন দত্ত লেনের সামনে একটা চালাঘর ভাড়া নিয়ে উল্লাসকরের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। উল্লাসকরকে তিনি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করতে দেখেন এবং দুটি ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠতে দেখেন। সতীশ তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করেন একশো চৌত্রিশ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ি পর্যন্ত।

হ্যারিসন রোডের বাড়ির অন্য কয়েকজন বাসিন্দাকে পুলিশ সাক্ষী মেনেছিল। তারা সকলেই উল্লাসকরকে চিনত কিন্তু বোমা নিয়ে তার ঘোরা ফেরার কথা সম্পূর্ণ অজানা। দুমাস ধরে মামলা চলল। অভিযুক্তদের কৌঁসুলীর জেরায় পুলিশের সাক্ষারা নাজেহাল হয়ে গেল। পুলিশের কথাবার্তা কোন নাটকের সাজানো সংলাপ বলে মনে হল। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান আলি জানের সাক্ষ্যও ছিল অসংলগ্ন ও নানা অসঙ্গতিতে ভরা। প্রসিকিউসন অভিযোগ প্রমাণ করতে চরম ভাবে ব্যর্থ হল। বেনিফিট অফ ডাউট্‌এ উল্লাসকর ও অন্যান্যরা সে যাত্রায় মুক্তি পেল। উদ্ধার করা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র-গুলো পুলিশ বাজেয়াপ্ত করল।

শিশির ভাদুড়ী যেদিন দেউলিয়া হলেন

সে এক চরম দুঃসংবাদেব দিন। নাট্যজগতেব যুগস্রস্টা নট ও প্রযোগপ্রধান শিশির কুমার ভাতুড়ী হাইকোর্টে আত্মসমর্পণ কবে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালেন। অনপনেয় কলঙ্কের কালিমায় বঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল।

ভাগ্যলক্ষ্মী কোনদিনই শিশির কুমাবের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না। জীবনে তিনি যত যশ পেয়েছেন সে অনুপাতে অর্থ পাননি। উনিশশো তিরিশ সালের শেষের দিকে তাঁর নিজস্ব রঙ্গালয় নাট্যমন্দির তিনি বন্ধ করে দিলেন। নিজের দল নিয়ে পাড়ি দিলেন সুদূর আমেরিকায়। দুঃখের কথা সেখানেও তিনি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। তখন অনেক গুলো মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু মামলার বিরোধিতা করার মত টাকা তাঁর নেই। মামলাগুলো এক তরফা ডিক্রী হয়ে গেল।

নাট্যমন্দির চালানোর সময়ে শিশির কুমার কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের কাছে মাঝে মাঝে টাকা ধার নিতেন এবং সাধ্যমত কিস্তিতে তা পরিশোধও করতেন। আমেরিকা যাওয়ার কিছু আগে তিনি ব্যাঙ্কের কাছে ন' হাজার টাকা নিয়ে আর শোধ করতে পারেননি। ইতিমধ্যে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ব্যবসা বন্ধ করে দেয়।

হাইকোর্টের আদেশে যুগ্ম রিসিভার নিযুক্ত হলেন রণজিত রায় ও অমিয়নাথ রায়। তাঁরা পাওনা টাকা আদায়ের জন্যে শিশির কুমারের নামে নালিশ করলেন। তখনও শিশির কুমার নাট্যমন্দিরের একশো আটত্রিশ নম্বর বাড়িতে থাকতেন। আদালত থেকে তাঁর নামে সমন গেল। তিনি সমন নিলেন না।

শিশির কুমার আদালতে হাজির না হওয়ায় বিচারপতি লর্ট উইলিয়মসের আদালতে মামলা সুদ সমেত ডিক্রী হয়ে গেল। দেয় দশ হাজার পাঁচশো সাত টাকা আট আনা। আদায়ের জন্যে অনেক চেষ্টা করেও রিসিভার বিফল হলেন। শিশির ভাদুড়ীর কোন সম্পত্তির হদিস তিনি পেলেন না যা আটক ও বিক্রী করে টাকা আদায় হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের আবেদন ক্রমে শিশির কুমারের ওপর নোটিশ জারি করা হল এই মর্মে যে আদালতের কাছে তিনি জবাবদিহি করুন টাকা অনাদায়ে কেন তাঁকে জেলে পাঠানো হবেনা। নোটিশ পেয়েও শিশির কুমার নিরুত্তর রইলেন। হাজির না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হল। উনিশশো তেত্রিশ সালের পঁচিশে জুলাই তারিখে কলকাতার শেরিফ তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করলেন। সেদিন এজলাসে বসেছিলেন বিচারপতি প্যাংক্রীজ। শিশির কুমার তাঁর বক্তব্য রাখলেন। উচ্চশিক্ষিত, সৌম্যদর্শন, মার্জিতরুচি অভিনেতার জীবনের ভাঙাগড়ার কাহিনী শুনে বিচারকের মনে বোধ হয় সহানুভূতি জেগেছিল। শিশিরকুমাকে তিনি হাজত বাস থেকে অব্যাহতি দিলেন এবং নিজেকে রক্ষার জন্যে বিধিবদ্ধ উপায়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার জন্যে এক মাসের সময় দিলেন। কোনরকম দেরি না করে সেই দিনই হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার অফ ইনসলভেন্সির কাছে দেউলিয়া হওয়ার জন্যে আবেদনপত্র পেশ করলেন তিনি।

পাওনাদারেরা সবাই রুখে দাঁড়াল। শিশির ভাদুড়ী তাঁর জবানবন্দী দিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল, উনিশশো তেইশ সালের নভেম্বর মাসে আমি অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করি এবং ডিসেম্বর মাসে ইডেন উদ্যানে পেশাদারী নাটক মঞ্চস্থ করি।

উনিশশো চব্বিশ সালে আমি আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে অভিনয় শুরু করি। সেই বছরেই জুন মাসে আমি মনমোহন থিয়েটার হাতে নিই। আমার নাট্য সংস্থার নাম ছিল নাট্যমন্দির। উনিশশো ছাব্বিশ সালের জানুয়ারীর চার তারিখে সেটা যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেজিস্ট্রী করা হয়। মে মাসে নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার লীজ নেয়। উনিশশো তিরিশ সালে নাট্যমন্দির লিমিটেড লিকুইডেশনে যায়। আমি এবং মন্মথনাথ ঘোষ যুগ্ম লিকুইডেটর। আমাদের কোম্পানীর হিসাব নিকাশের সমস্ত খাতাপত্র মন্মথনাথ ঘোষের কাছে আছে। আমি বরাবরই নাট্যমন্দিরের অন্যতম ডিরেকটর ছিলাম এবং আমার শেয়ারের দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। কোম্পানীতে আমার গুডউইলের জন্যে ওই দামের শেয়ার আমাকে বণ্টন করা হয়েছিল। কোম্পানীর যাবতায় সম্পত্তি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাছে দায়াবদ্ধ ছিল। কোন নাটকের সর্বস্বত্ব কোম্পানীর ছিল না। প্রথমে আমি মাসিক বারশো পঞ্চাশ টাকা পেতাম। দু'বছর ব্যবসা চলার পর আমি মাসিক হাজার টাকা পেতাম। থিয়েটার বন্ধ হওয়ার পর ছ'মাস আমি রঙমহলে অভিনয় করি। মোট বিক্রীর শতকরা কুড়ি ভাগ আমি পারিশ্রমিক পেতাম। উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় দুখানি ছায়াছবিতে আমি অংশ গ্রহণ করি এবং মাঝে মাঝে নব নাট্যমন্দিরে অভিনয় করি। তখন আমার বার্ষিক আয় ছিল আঠার হাজার টাকা। কিন্তু তার পরে সেটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় সাত হাজারে। আমার আয় থেকে প্রতিমাসে আমি সাধ্যমত পাওনাদারের টাকা মিটিয়ে দিতাম। আমি কোনদিন আমার আয়ব্যয়ের হিসাবের খাতা রাখিনি।

শিশির কুমারের সেদিনের জবানবন্দী থেকে আরও জানা যায়, উনিশশো পনের সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। সোনারপুর এলাকার কুলপিতে এবং হাওড়ায় তাঁদের কিছু জমি জায়গা ছিল। তিনি কোন দিনই জমি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছিতে।

কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ছাড়া পাওনাদারদের তালিকায়

ছিল অশ্বিনী কুমার মুখার্জি, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, যোগেশ চন্দ্র প্রামাণিক, গোরাচাঁদ দে, অফিসিয়াল রিসিভার, সুবোধ চন্দ্র মিত্র, প্রভাত কুমার চৌধুরী। পাওনাদারদের আপত্তি সত্ত্বেও উনিশশো তেত্রিশ সালের পঁচিশে জুলাই শিশির কুমারকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হল। অবশ্য তার প্রায় চার বছর পরে তিনি দেউলিয়া আখ্যা থেকে মুক্তি পান।

উইলিয়ম টেলর ও ইংলিশম্যান

আঠারশো উনসত্তর সাল। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের এজলাসে একটা মামলার শুনানী চলছিল। জেবুন্নেসা নামে এক মহিলা মামলা করেছিল হাইকোর্টের এক উকীল উইলিয়ম টেলরেব নামে। সে যুগে ইংরেজরা ভাবতে পারত না কোন মামলায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যাবে। টেলরও ভাবতে পারেন নি। তবু জেবুন্নেসার অনুকূলে মামলার রায় বের হল। টেলর হতাশ হলেন। এবং ক্ষুব্ধ। মোকদ্দমার বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি সে যুগের ইংরাজি দৈনিক 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় কয়েকখানি চিঠি প্রকাশ করলেন। ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিলের বিভিন্ন তারিখে চিঠিগুলো ছাপা হয়েছিল। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র সেগুলো দেখে প্রধান বিচারপতির নজরে আনলেন। সেই সময়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন বার্নেস পিকক। চিঠিগুলো পড়ে তিনি বললেন, অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যাপার। টেলরের উদ্ধত উক্তিতে আদালতের অবমাননা হয়েছে। টেলরকে কেন জেল-এ পাঠানো হবে না তার কারণ দেখাতে তার ওপর রুল জারী করলেন তিনি। প্রধান বিচারপতির নির্দেশ গ্রাহ্য করলেন না উইলিয়ম টেলর। হাজিরা দেওয়ার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর বার্নেস পিকক তার

নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করলেন। হতে পারে টেলর একজন ইংরেজ নাগরিক। আদালতের বিচার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার অধিকার তার নেই।

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা হাতে নিয়ে কলকাতার শেরিফ ছুটলেন উইলিয়ম টেলরকে ধরে আনতে। বার্নেস পিককের আদেশ টেলরকে প্রকাশ্য আদালতে তার ঔদ্ধত্যের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আদেশ পালন করতে গিয়ে শেরিফ হতাশ হলেন। টেলর বাড়িতে নেই। জানা গেল, কলকাতার বাইরে যাবার জন্যে চাঁদপাল ঘাটে গেছে টেলর। স্টীমারের টিকিটও কেনা হয়ে গেছে। সে কথা শোনা মাত্র লোকজন নিয়ে শেরিফ ছুটলেন চাঁদপাল ঘাটে। সেখানে যখন পৌঁছালেন তখন স্টীমার ছেড়ে দিয়েছে। গঙ্গার বুকে বড় বড় ঢেউ তুলে স্টীমারটা তখন ক্রমশই দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শেরিফ। জাহাজ ঘাটের অফিস ঘরে গিয়ে শেরিফ খোঁজ নিলেন ছেড়ে যাওয়া স্টীমারে উইলিয়ম টেলর গেছেন কিনা। টেলর তখনকার কলকাতার নামকরা লোক ছিলেন। বিভিন্ন অফিস কাছারীর লোকজন তাকে চিনত। স্টীমারের কর্তৃপক্ষ বললে, টেলর টিকিট কিনেছিলেন কিন্তু জায়গার অভাবের জন্যে তিনি যেতে পারেন নি। পরের দিন তাঁর যাওয়ার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সে কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন শেরিফ। আবার ছুটলেন টেলরের সন্ধানে। টেলর বাড়ি নেই। অনেক খোঁজার পর জানা গেল ছাব্বিশ নম্বর থিয়েটার রোড-এ হবহাউস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে টেলর আছেন। সেখানে গিয়ে শেরিফ তাকে গ্রেপ্তার করলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় টেলব তখন অবাক। আদালত এমন কঠোর ব্যবস্থা নেবে একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি এখানে তখন বৃটিশ শাসনের গৌরবময় যুগ। উইলিয়ম টেলর কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ইংরেজ উকীল। দ্বারকানাথ মিত্র সামান্য বাঙালী বিচারপতি। বাঙালী বিচারপতির প্রতি মন্তব্য করে কাগজে কয়েকটি চিঠি ছাপার জন্যে একজন ইংরেজকে জবাব-দিহি করতে হবে, এ ছিল সে যুগে ইংরেজদের কল্পনার বাইরে। সেই

ধারণার বশবর্তী হয়েই টেলর নির্ভয়ে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের সমালোচনা করেছিলেন।

টেলরকে যখন আদালতে হাজির করা হল তখন সেখানে প্রচণ্ড উত্তেজনা। খবরের কাগজের পাতায় বড় বড় হরফে হেডলাইন। সে যুগের ইউরোপীয় সমাজে চাপা বিক্ষোভ। অভিজাত ইংরেজরা দল বেঁধে টেলরের বিচার দেখতে এসেছিলেন। বার্নেস পিকক যে এত কঠোর হবেন তাদের কারও ধারণা ছিল না। পিককও এজলাসে বসে বুঝেছিলেন জনমত তাঁর বিরুদ্ধে কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। আদালতের অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। সেখানে ভারতীয় বা ইংরেজের কোন প্রশ্ন নেই। আইনের ব্যাপারে সকলেই সমান।

আদালতের আবহাওয়া দেখে টেলর বুঝেছিলেন অবস্থা সুবিধের নয়। তবুও নিজের জেদে তিনি ছিলেন অটল। দুবিনীত আচরণ করেও নিজের দোষ তিনি স্বীকার না করে সওয়াল চালিয়ে গেলেন। বিতর্কিত শুনানীর পর বিচারপতি বার্নেস পিকক ও দ্বারকানাথ মিত্র রায় দিলেন। আদালত অবমাননার দায়ে উইলিয়ম টেলরের একমাস কারাবাস ও পাঁচশো টাকা জরিমানার আদেশ হল।

এই নির্ভীক নিরপেক্ষ বিচারে সেদিন আদালতে উত্তেজনার অন্ত ছিল না। ইংরেজ দর্শকরা হায় হায় করতে লাগল। লজ্জায় অপমানে টেলর কাঁপতে লাগলেন। তাঁকে তখন খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। টেলরকে অনুতপ্ত দেখে এবং তাঁর বয়সের কথা ভেবে বিচারকরা শাস্তির মেয়াদের কথা চিন্তা করলেন। তাঁরা বললেন, টেলর যদি 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে। কয়েকদিন হাজতবাসের পর টেলর ইংলিশম্যান পত্রিকা মারফৎ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কারাভোগ থেকে অব্যহতি দেওয়া হল তাঁকে।

টেলর ছাড়া পেলেন কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই থেমে গেল না। টেলরের বিচার কলকাতা তথা সারা ভারতের ইংরেজ সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। টেলরের সাজা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে কলকাতার ইংরেজরা হতাশ হয়ে পড়ল। তারা তখন নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগল। এই ঘটনার আগে এ ধরনের বিচার বা শাস্তির কথা তারা ভাবতে পারে নি। ইংরেজ পরিচালিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলো টেলরের জন্যে গভীর দুঃখ প্রকাশ করল। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য চিঠি এসে জমা হতে লাগল সম্পাদকের দপ্তরে। আদালতের রায় শুনে পত্রদাতারা মর্মাহত। টেলরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার ভাষা তাদের চিঠিতে। শ্রীরামপুর থেকে মার্শাল ডি'ক্রুজ পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা এই বিচারের দীর্ঘ সমালোচনা করল। সম্পাদকের মন্তব্য, টেলর যা দোষ করেছে তার জন্যে জরিনানাই ছিল যথেষ্ট। জেলখানায় পাঠানোর মতো অপরাধ সে করেনি।

কলকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা উইলিয়ম টেলরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় তুলল। ছাব্বিশে এপ্রিল তারিখে ছাপা হল আদালতের বিচারকে কটাক্ষ করে সম্পাদকীয় মন্তব্য। সম্পাদক লিখলেন, টেলরকে যা শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা অন্যায় ও নিষ্ঠুর। বয়সের দিক থেকে বিচার করলে তাকে বৃদ্ধই বলা যায়। তার মতো বর্ষীয়ান এক আইনজীবীকে কারাদণ্ড দেওয়া মৃত্যুদণ্ডেরই নামান্তর। টেলরের লেখা চিঠিগুলো আপত্তিকর বলে বিবেচিত হলেও আদালত লঘু পাপে গুরুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। সম্পাদক আরও লিখলেন, 'ইংলিশম্যানের' এর নির্ভীক সম্পাদক অতীতে কোনদিন নিরপেক্ষ সমালোচনা থেকে নিরত থাকেনি। সুস্থ সমালোচনা তারা চিরদিন করবে। আদালতের কোন নির্দেশ তাদের কলম কোনদিনই থামাতে পারবে না।

এই সম্পদকীয় মতামত ছাপার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের অঙ্গনে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল। আদালতকে কটাক্ষ করে এমন অপমানসূচক কথা এর আগে কোন সংবাদপত্র ছাপেনি। প্রধান বিচারপতি বার্নেস পিকক অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে একটা জরুরী সভা ডাকলেন। কাগজের মন্তব্য পড়ে সকলেই বললেন, উদ্ধত সম্পাদকের বিচার চাই। জজের বিচারের সমালোচনা কিছুতেই সহ্য করা হবে

না। সঙ্গে সঙ্গে রুল জারা করা হল 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার ওপর। অশোভন উক্তির জন্যে প্রকাশ্য আদলতে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেই দিনই নোটিশ ধরানো হল। আবার দুজন খাস ইংরেজ অভিযুক্ত হল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রকাশক আলেকজাণ্ডার ব্যাঙ্কস্ এবং সম্পাদকের নাম ক্যাপ্টেন জর্জ রো ফেন্উইক কোর্টের পরোয়ানা পেয়ে তাঁরা হতবাক। উঁচুতলার ইংরেজদের কাছে তাঁদের প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। তাঁরা ভাবতে পারেন নি আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেবে। সংবাদপত্র যদি সমালোচনা না করে তাহলে করবে কে?

আবার আদালতে ভীষণ উত্তেজনা। 'ইংলিশম্যান'কে সমর্থন করে একটা বিরাট দল গড়ে উঠল। তার পুরো ভাগে ছিল বিদেশী সাংবাদিক ও বিদেশী নাগরিক। প্রধান বিচারপতি বার্নেস পিকক ও বিচারপতি ম্যাকফারসনের এজলাসে দুদিন ধরে শুনানী চলল। একদিকে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অন্যদিকে অভিযুক্তদের ব্যারিষ্টার। কিন্তু অবস্থা ঘোরালো দেখে শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কস্ ও ফেনউইক স্বীকার করতে বাধ্য হলেন আদালতের বিচারের ওপর মন্তব্য করে সম্পাদকীয় লেখা সত্যিই অন্যায়। বিচারপতিরা বললেন, সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বা সমালোচনার ব্যাপারে সাংবাদিকদের স্বাধীনতার একটা সীমা আছে। অভিযুক্ত দুজন সেই সীমা লঙ্ঘন করেছে। কথা না বাড়িয়ে প্রকাশক ও সম্পাদক অপরাধ স্বীকার করলেন এবং নিঃশর্তে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। আদালত দুজনকেই মুক্তি দিল। আইনের দুনিয়ার বেঁচে রইল দুই সাংবাদিকের নাম। আলেকজাণ্ডার ব্যাঙ্কস্ ও ক্যাপ্টেন ফেনউইক।

নকল রাজা

বর্ধমান রাজবাড়ির প্রান্তদেশে গোলাপবাগের প্রবেশ পথে এক রূপবান সাধু ঘোরাফেরা করছিল। এক লহমায় দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার মত তার তেজদীপ্ত দেহ। তাকে দেখে সবার আগে যে লোকটি চমকে উঠেছিল সে বর্ধমানের খুব পুরানো একটা মিষ্টির দোকানের মালিক গোপীনাথ ময়রা। চাপা গলায় সে স্বগতোক্তি করল, আরে! এযে আমাদের ছোট রাজা। সে কথা শুনে সাধু কোন জবাব দেয়নি। শুধু মৃদু হেসে তাকিয়েছিল গোপীনাথ ময়রার মুখের দিকে।

কানে কানে ছড়িয়ে পড়ল ছোট রাজা ফিরে এসেছে। রাজ বাড়ির দেওয়াল ভেদ করে সে কথা পৌঁছাল অন্দরমহলে। পোরান বাবু ঘামতে শুরু করলেন। তিনি তখন রাজ বাড়ির সর্বময় কর্তা। কোথাকার কোন সাধুকে নিয়ে তার জমিদারীর লোক মেতে উঠবে তা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। সারা রাত পোরানবাবুর চোখে ঘুম এল না। রাত ভোর হতে তিনি ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, ঘোড় সওয়ারদের তৈরি হতে বলো। যে সাধুটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে সীমানার বাইরে পার করে দিতে হবে।

ধুলো উড়িয়ে তখনি ছুটল ঘোড় সওয়ারের দল। সাধুকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তারা বর্ধমানের সীমানার বাইরে দিয়ে এল।

আত্মগোপন করে সাধু চলে গেলেন বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রনাথ সিং দেখা মাত্রই তাঁকে চিনলেন। বর্ধমানের ছোটরাজা প্রতাপচাঁদ ফিরে এসেছেন। এতদিন যা রটনা হয়েছে তা মিথ্যা। প্রতাপচাঁদ তাহলে জীবিত। ক্ষেত্রনাথ পরম সমাদরে রাজকীয় মর্যাদায় তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

এ কাহিনীর পূর্বকথা লোভ, লালসা, পাপ আর পঙ্কিলতায় ভরা। সেই সময়ের রাজা তেজচন্দ্র ছিলেন এক কামোন্মত্ত বিলাসী পুরুষ। রাজা তেজচন্দ্রের ছেলে প্রতাপচাঁদ। প্রতাপের মা যখন মারা যায় তখন সে খুব ছোট। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তেজচন্দ্রের কোন টান ছিল না ছেলের ওপর। তিনি তখন ভোগ বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসমান। প্রতাপের ঠাকুমা মহারাণী বিষেণ কুমারীর কাছে প্রতাপের লালন পালনের ভার পড়ল। তেজচন্দ্রের বয়স যখন চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে তখন তিনি আবার বিয়ে করার জন্যে মেতে উঠলেন। সুযোগ বুঝে এগিয়ে এসেছিল একটি লোক। তার নাম কাশীনাথ। তেজ-চন্দ্রের জমিদারী সেরেস্তার এক সামান্য কর্মচারী। নিজের মেয়েকে সে এগিয়ে দিল রাজার ভোগের জন্যে। কাশীনাথের মেয়ে কমল-কুমারীকে বিয়ে করলেন তেজচন্দ্র। কাশীনাথ তখন হয়ে উঠল মোগল ইতিহাসের নূরজাহানের বাবার মতো। তেজচন্দ্র তখন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি কাশীনাথের খেলার পুতুল। তাঁর ওপর কাশীনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল প্রচণ্ড রকমের দৃষ্টি-কটু। তেজচন্দ্র তবুও শুধু কমল কুমারীকে নিয়েই তৃপ্ত থাকেননি। তার পত্নী আর উপপত্নীর সংখ্যা ছিল আধ ডজন। তার জীবনে সব-চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আর অভিশাপ, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শেষ বিয়ে। অষ্টাদশী বসন্তকুমারীকে বিয়ে করে ঘরে আনলেন তেজচন্দ্র। বসন্ত কুমারী তেজচন্দ্রের অপর স্ত্রী কমলকুমারীর ভাই পোরানবাবুর মেয়ে। অর্থাৎ কাশীনাথের নাতনি। ভোগের সাগরে ডুবে গেলেন তেজচন্দ্র।

ওদিকে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত প্রতাপ তখন ঠাকুমার আদরে বড় হয়ে উঠেছে। লেখাপড়ায় তার মন ছিলনা। মেজাজ ছিল রাজার ছেলের মতোই। লেখাপড়া না শিখলেও প্রতাপের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার এবং

অসাধারণ। প্রতাপ ছিল খুব মিশুকে ও বন্ধুবৎসল। বর্ধমানে তার পরিচয় ছিল 'ছোট রাজা'। তার বন্ধুদের মধ্যে ছিল সিঙ্গুরের জমিদার রূপবান সৌখিন শ্রীনাথ যাকে লোক নবাব বাবু বলে এক ডাকে চিনত, তেলেনি পাড়ার জমিদার রামধন বাবু, চুঁচড়ার ওলন্দাজ সরকারের শেষ গভর্ণর ড্যানিয়েল অ্যাণ্টনিও ও ভাডারবেক, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি।

প্রতাপচাঁদের চরিত্র ছিল অদ্ভুত ধরণের। কখনও সে চঞ্চল কখন স্থির। কখনও উচ্ছৃংখল কখনও সংযমী। আমোদে মেতে থাকতে থাকতেই একদিন প্রতাপের খেয়াল হল তার বৃদ্ধ বাবা তেজচন্দ্র তার প্রতি নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত। অন্যান্য বাইরের লোক বিশেষ করে পোরান বাবুর দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। তখন সে একদিন বাবার মুখোমুখি হলো। বাবাকে দিয়ে জোর করে সে একটা দানপত্র লিখিয়ে নিল। জমিদারীর সমস্ত ভার সে নিজের হাতে তুলে নিল। জমিদারীর অনেক সংস্কার ও উন্নতি করল। প্রজাবৎসল ছোট রাজা সাধারণের মনে ঠাঁই করে নিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতাপ তাল রাখতে পারল না ঘরে তার দুই সুন্দরী স্ত্রী পিয়ারী ও আনন্দকুমারী। প্রতাপ তাদের নাগালের বাইরে চলে গেল। মদ আর মেয়ে মানুষের মধ্যে ডুবে গেল সে। রাজা তেজচন্দ্র দেখলেন, তাঁর সব রোগই ছেলের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। প্রবৃত্তির যে তাড়নায় প্রতাপ অহরহ ছুটে চলেছে তা থেকে তাকে ফেরানো অসম্ভব। বিরোধ বাধল বাপ আর ছেলের মধ্যে। প্রতাপ তখন উদ্ধত দুর্বিনীত। বাবার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে নারাজ সে।

প্রতাপের বয়স তখন ছাব্বিশ পার হয়েছে। হঠাৎ সে বদলে গেল। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় সারাদিন সে ছটফট করতে থাকে। কোন কাজে মন নেই। কারও সঙ্গে কথা বলতেও তার মন চাইত না। সব সময় একা থাকত সে। এমন কি তার স্ত্রীদেরও তার কাছে যাওয়া বারণ ছিল। সেই সময়ে একজন ইউরোপীয় চিত্রকরকে দিয়ে সে নিজের একটা পূর্ণ অবয়ব তৈলচিত্র করাচ্ছিল। প্রতাপের ঘরে একমাত্র তারই ছিল প্রবেশের অধিকার। এইভাবে প্রায় দু'বছর কাটার পর

প্রতাপ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। গা থেকে জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। একটু সুস্থ হওয়ার পর প্রতাপ ঠিক করল কালনায় গিয়ে নদীর ধারে একটা বাড়িতে সে বিশ্রাম নিতে যাবে। ব্যবস্থাও সেইমতো হল। কিন্তু কোনো আত্মীয় পরিজনকে সে সঙ্গে নিতে চাইল না। এমনকি তার দুই স্ত্রী পিয়ারী ও আনন্দকুমারীও তার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেল না। তার পরের ঘটনা খুবই রহস্যাবৃত। কালনায় গঙ্গার ধারের সেই বাড়িতে নিঃসঙ্গ প্রতাপচাঁদ মারা যায় ১৮২১ সালে। তার বয়স তখন উনত্রিশ বছর দু মাস। সে কালের সমাচার-দর্পণ কাগজে তার মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিল।

প্রতাপ মারা যাওয়ার খবরের তিন চারদিন পরে বর্ধমানে গুজব রটে গেল ছোট রাজা মরেনি। শ্মশান ঘাট থেকে জীবিত অবস্থায় সে কোথাও পালিয়ে গেছে। কিন্তু রাজবাড়ির কেউ সে কথা বিশ্বাস করেনি। সমস্ত ব্যাপারটাই তখন গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল। রাজা তেজচন্দ্র প্রতাপের নামে তো আগেই দানপত্র লিখে দিয়েছেন। প্রতাপেরও কোন সন্তান নেই। তাহলে বর্ধমান রাজবাড়ির ভবিষ্যৎ কী? এ কথা পোরানবাবুও ভাবছিলেন। তেজচন্দ্রের এতগুলো পত্নী ও উপপত্নী সত্বেও তাঁর দ্বিতীয় কোন সন্তান নেই। সুযোগ বুঝে প্রতাপের দুই স্ত্রী পিয়ারী ও আনন্দকুমারী সম্পত্তি দখলের জন্যে তেজচন্দ্রের নামে মামলা করল। সেই মামলায় তেজচন্দ্র প্রতাপের অনুকূলে দেওয়া দানপত্র বাতিল করে দিলেন। আদালত তা মেনে নিল। বিশাল সম্পত্তি আবার ফিরে এল তেজচন্দ্রের হাতে। পোরানবাবুর মুখে হাসি। জয়ের হাসি। লোভের কুটিল চক্রান্তের হাসি। রাজা তেজচন্দ্রকে একদিন তিনি একান্তে বললেন, আপনার এই বিশাল জমিদারী রক্ষা করার জন্যে কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী নেই। আপনার অবর্তমানে এই বিশাল জমিদারার কি হাল হবে ভেবে দেখেছেন কি? রাজা তেজচন্দ্রও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তো? ভবিষ্যতে কে এই জমিদারীর হাল ধরবে। পোরানবাবু তখন আড়ালে ক্রূর হাসি হাসছিলেন। রাজা তেজচন্দ্রকে তিনি একটি দত্তক পুত্র নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। বয়সের ভারে জীর্ণ রাজা

তখন পোরানবাবুর পুরো কব্জায়। পোরানবাবু তার ছোট ছেলেকে দান করলেন। রাজা তেজচন্দ্র বিরাট অনুষ্ঠান করে তাকে দত্তক গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে সেই ছেলেই বর্ধমানের রাজা মহাতপ চাঁদ। ১৮৩২ সালে রাজা তেজচন্দ্র মারা গেলেন। মহাতপ চাঁদ তখনও নাবালক। জমিদারী চালানোর ভার পড়ল কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ওপর। অবশ্য পোরানবাবুই তখন সর্বময় কর্তা।

তেজচন্দ্র মারা যাওয়ার তিনবছর পরে আবির্ভাব হয়েছিল সেই সাধুর যাকে পোরানবাবুর ঘোড় সওয়ার বর্ধমানের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। যে সাধু নিজেকে ছোট রাজা প্রতাপচাঁদ বলে দাবী করেছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রনাথ সিংএর কাছে কিছু দিন থাকার পর সাধু রওনা হল বাঁকুড়া। সেখানকার জেলাশাসক তখন জেম্‌স বেলফোর ইলিয়ট। তার কাছে গিয়ে সাধু নিজেকে বর্ধমানের ছোট রাজা বলে পরিচয় দিল। বললে, কয়েকজন স্বার্থান্বেষী লোক আমাকে বর্ধমানে ঢুকতে দিচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেট তার বক্তব্য শোনার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করলেন। তার স্থান হল বাঁকুড়ার জেলখানায়। পোরানবাবু আশপাশের সমস্ত জেলাতেই খবর পাঠিয়েছিলেন, এক নকল প্রতাপচাঁদ হাজির হয়েছে। তার জমিদারীতে যাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তার জন্যে সব জেলা ম্যাজিটে কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সাধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা পরিচয় দানের অভিযোগ আনা হল। বিচারের জন্যে তাকে হুগলীতে চালান দেওয়া হল।

হুগলীর দায়রা জজ হ্যারিংটনের এজলাসে যখন সাধুকে আনা হল তখন সেখানে চরম উত্তেজনা। লোকের ভীড়ে আদালত সমাকীর্ণ। সন্ন্যাসীর পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট থেকে এলেন ব্যারিস্টার টমাস টারটন। কিন্তু আদালত তার কোন কথা শুনতে রাজি হল না। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরল। নিরাশ হয়ে টমাস টারটন কলকাতায় ফিরে গেলেন। সদর নিজামত আদালতে সব ঘটনা বিবৃত করে তিনি আবেদন পেশ করলেন। সেখানেও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। আর কিছুই করার

রইল না। ওদিকে হুগলীর দায়রা আদালতে শৃংখলিত সাধুর এক তরফা বিচার চলল। সেখানে প্রমাণ হয়ে গেল সন্ন্যাসীর আসল নাম অলুক সিং। নাম ভাঁড়িয়ে নিজেকে সে বর্ধমানের ছোট রাজা বলে পরিচয় দিচ্ছে এবং দেশের শান্তি ব্যাহত করছে। ১৮৩৬ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে হুগলীর আদালত সাধুকে ছ'মাসের কারাদণ্ড দিল।

দেখতে দেখতে ছ মাস কেটে গেল। কারাবাসের মেয়াদ শেষ হলে সন্ন্যাসী কলকাতায় চলে এল। এখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাকে বর্ধমানের ছোট রাজা বলে চিনতে পারল। এতদিন পরে এক হারানো বন্ধুকে পেয়ে খুশি হল তারা। এখানকার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে মামলা করল সন্ন্যাসী। তার দাবী সে ছোট রাজা প্রতাপচাঁদ। সে মরেনি। সে জীবিত। তাকে তার সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার দেওয়া হোক। এই মামলায় পোরানবাবু আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রাসাদের ভিতটা বুঝি আবার কেঁপে উঠল। নাবালক মহাতপ চাঁদের হয়ে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এগিয়ে এল মামলা লড়তে। সৎমা বসন্ত-কুমারীও রুখে দাঁড়াল।

রাজবাড়ির পক্ষ থেকে বর্ধমানের কয়েকজন লোককে সাক্ষ্য মানা হল। তারা সকলেই ছিল বিশেষ প্রভাবশালী। প্রতাপচাঁদও সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাল। তার হয়েও সাক্ষী দেওয়ার বহু লোক সেখানে আছে। সে আবেদন বিবেচনার জন্যে পৌঁছাল ডেপুটি গভর্ণর আলেকজাণ্ডার রসের কাছে। কিন্তু তা গ্রাহ্য হল না। গভর্ণরের সেক্রেটারী ফ্রেডারিক জেম্‌স তাকে সে কথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রতাপচাঁদ ভয় পাওয়ার পাত্র নন। তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন। কলকাতার বাইরে যাওয়ার তার অনুমতি ছিল না। তবু সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তিরিশ চল্লিশ জন সঙ্গী নিয়ে জগন্নাথ ঘাট থেকে একটা বড় নৌকোয় কালনার পথে রওনা হলেন ১৮৩৮ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে। নৌবক্ষ থেকে তিনি মোক্তারকে পাঠালেন বর্ধমানের জেলা-জজের কাছে। সঙ্গে তার আবেদনপত্র। মামলার প্রয়োজনে তাকে যেন

বর্ধমানের সীমানার মধ্যে .ঢুকতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতাপচাঁদের দরখাস্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছানোর আগেই বর্ধমানের পুলিশ মোক্তার দুজনকে ধরে হাজতে পুরে দিল। ম্যাজিস্ট্রেট কালনায় খবর পাঠালেন সন্ন্যাসীকে যেন সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। যদি সে না যেতে চায় তাকে যেন ধরে আনা হয়।

ওদিকে রাজবাড়ির অন্দর মহলে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছে। পোরানবাবুর চোখে ঘুম নেই। হিংস্র নির্মম পোরানবাবু বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে দিচ্ছেন রাজবাড়ির অলিন্দে পায়চারি করে। যে কোন উপায়ে সন্ন্যাসীর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। উদ্ধত সন্ন্যাসীকে রাজাজ্ঞা অবহেলা করার জন্যে ওপর মহলকে তিনি উত্তেজিত করতে লাগলেন। তারই পরামর্শে ম্যাজিস্ট্রেট জেম্‌স আলেকজাণ্ডার অগিল্‌ভি বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করতে। সঙ্গে অ্যাডজুটাণ্ট ডাক্তার চিক।

ঘন অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক। প্রতাপচাঁদ আর তার দলবল নৌকোর মধ্যে ঘুমে অচেতন নদীর ওপার থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জে উঠল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বৃষ্টির ধারার মতো গুলি চলল। প্রতাপ ঘুম ভেঙে হতবাক। সঙ্গীরা দিশাহারা। প্রাণ ভয়ে তারা চিৎকার করতে লাগল। জীবন বিপন্ন করে তারা নদীতে ঝাঁপ দিল। অনেক নিরীহ লোক গুলিতে প্রাণ হারাল। প্রতাপ চাঁদও ঝাঁপ দিলেন গঙ্গার বুকে। তার সঙ্গে ছিলেন নদীয়ার রাজা নরহরি চন্দ্র। সাঁতার কেটে শেষ রাতে ওরা দুজনে উঠলেন শান্তিপুরের ঘাটে। সঙ্গীদের জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠলেন প্রতাপ।

এই নাটক সেখানেই শেষ হয়নি জেলায় জেলায় শুরু হল তল্লাসী আর ধরাপাকড়। প্রতাপের সমর্থকদের মধ্যে প্রায় তিনশো লোক পুলিশের হাতে বন্দী হল। প্রতাপও পালিয়ে বাঁচতে চাননি। তিনি ধরা দিলেন। সঙ্গে তার বন্ধু নরহরি চন্দ্র। প্রতাপের অ্যাটর্নি উইলিয়ম ডালরিম্‌পল শ কলকাতা থেকে ছুটে গেলেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি তাকে ছাড়াতে পারলেন না। পুলিশ পাহারায় তাকে

হুগলীতে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া হল। তারপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই, এ, স্যামুয়েলের কাছে তার বিচার শুরু হল। আসল নাম গোপন করে নিজেকে বর্ধমানের ছোট রাজা প্রতাপ চাঁদ বলে মিথ্যা পরিচয় দানের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সেখানে চার্জ গঠন করে মামলা পাঠানো হল দায়রা জজের কাছে। বিচারপতি জুরী-নিয়োগ করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে তেলেনিপাড়ার আনন্দ প্রসাদ ব্যানার্জি ছাড়া বাকি সকলে জুরী হতে অস্বীকার করলেন। সেই কারণে মামলার শুনানী কদিন পেছিয়ে গেল। চারটি প্রশ্ন ছিল বিচার্য। প্রতাপ চাঁদের সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্য, কালনায় প্রতাপের মৃত্যু, নদীয়ার কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কে? এবং কালনায় নদীবক্ষে আইন বিরুদ্ধ জমায়েত। এই মামলায় সরকারের পক্ষে প্রায় ষোল-জন সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে নামকরা যেতে পারে যাদের তাঁরা হল চুঁচড়ার জর্জ হার্কলট্স, সেক্রেটারী হেনরী প্রিনসেপ, কালেকটর সি, ট্রয়ার, মেজর জন মার্শাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাধাকান্ত বসাক। এ ছাড়া এক নীরব সাক্ষী ছিল প্রতাপ চাঁদের একটা পূর্ণ অবয়ব তৈলচিত্র।

জেরার উত্তরে হার্কলট্স বললে, বন্দী আসামী প্রতাপ চাঁদ নয়। প্রিন্সেপ বললে, আমি হলফ করে বলতে পারি এ লোক প্রতাপ চাঁদ হতেই পারে না। ট্রয়ার ১৮০৮ থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বর্ধমানের কালেকটর হিসেবে কাজ করেছিল। প্রতাপ চাঁদ সে সময়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। অনেক দিন ওরা একসঙ্গে দাবা খেলেছিল। সাক্ষী দিতে উঠে ট্রয়ার বললে, এ লোক প্রতাপ চাঁদ নয়।

হ্যালিডে নামে এক ডাক্তার বললে, আমি আসামীকে চিনি। তাকে ছোট রাজা বলেই মনে হচ্ছে। চুঁচড়ায় ওর সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বক্তব্য, সত্যিই যদি এই আসামী প্রতাপ চাঁদ হত তাহলে আমি নিজের পকেট থেকে পাঁচ লাখ টাকা দিতাম।

রাধাকান্ত বসাক ডাক্তার হ্যালিডেকে সমর্থন করেছিল এবং প্রতাপকে এই মামলা চালানোর জন্যে খরচ জুগিয়েছিল।

প্রতাপের পক্ষে সাক্ষী ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন। তার মধ্যে ছিলেন মাদ্রাজ নেটিভ ইন্‌ফ্যানট্রির রবার্ট স্কট, চুঁচড়ার ওলন্দাজ গভর্ণর ড্যানি'য়ল অ্যাণ্টনিও ওভারবেক, নীল ব্যবসায়ী ডাক্তার লিওটার্ড, ডেভিড হেয়ার, বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রনাথ সিং, বর্ধমানের সার্জন ডাক্তার স্কট। ডাক্তার বললেন, আমার বিশ্বাস, ইনিই ছোট রাজা। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ১৮১৫ থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত এর সঙ্গে আমার খুবই মেলামেশা ছিল ওভারবেক প্রতাপকে দেখিয়ে বললেন, বন্দীকে আমি ছোট রাজা বলে চিনতে পারছি। ওর মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়ার কয়েকদিন পরেই আমার কানে আসে ছোট রাজা জীবিত এবং অন্য কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

ডেভিড হেয়ার বললেন, আমার সঙ্গে ছোট রাজার বিশেষ পরিচয় ছিল। তার চৌরঙ্গীর বাড়িতে আমি ছ'সাত বার গেছি। আসামীর সঙ্গে প্রতাপের যথেষ্ট সাদৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি তাছাড়া, পাশের ঘরে যে তৈলচিত্রটি রাখা হয়েছে তার সঙ্গে আমি এর চেহারার কোন তফাৎ দেখছি না।

বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন বললেন, আসামী যে রাজা প্রতাপ-চাঁদ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তিন চার বছর আগে আমি একে আশ্রয় দিয়েছিলাম বলে বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে ভর্ৎসনা করেছিল। আমি তাতে কান দিইনি

সাক্ষীদের জবানবন্দীর পর দুপক্ষের সওয়াল শুরু হল। আদালতে প্রচণ্ড উত্তেজনা। বর্ধমান রাজবাড়ির অন্তঃপুরেও উত্তেজনা কিছু কম ছিল না। এতদিন মুখ ফিরিয়ে বসে থেকে নাটকের শেষ দৃশ্যে দুই রাণী প্রতাপকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। পর্দা অমান্য করে ওরা বাইরে আসতে চাইল একবার যাচাই করে দেখতে কে এই প্রতাপচাঁদ। কিন্তু আসব বললেই তো আর আসা যায় না। পোরান-বাবুর কঠোর অনুশাসন সেখানে। তারই অঙ্গুলি নির্দেশে রাজবাড়ির সবকিছু চলছে। রাণীরা সন্ন্যাসীকে দেখার অনুমতি পেল না। প্রতাপের পিসীমা রাণী তোতা এবং মাসীমা বাদাম বিবিও উৎসুক হয়েছিল তাকে দেখতে। তারাও ছাড়পত্র পায়নি। ওদের দুজনকে

এবং বড় রাণীকে শেষ পর্যন্ত আদালত থেকে সমন পাঠানো হয়েছিল হাজির হওয়ার জন্যে। ওরা আদালতকে চিঠি লিখে জানাল যে প্রতাপ মৃত সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিত। একটা ভবঘুরে সন্ন্যাসীকে সনাক্ত করতে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আদালতকে এ ভাবে চিঠি লেখা ছাড়া ওদের কোন উপায়ও ছিল না। ওদের চলাফেরা ছিল সম্পূর্ণভাবে পোরানবাবুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাড়ির পুরানো চাকর যারা প্রতাপের ছেলেবেলায় তার সেবাযত্ন করেছিল তাদের কাউকেই সাক্ষী ডাকা হয়নি। পোরানবাবুর কিছু বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রতাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। প্রতাপের ছিল দুরন্ত মনোবল আর হাজার হাজার সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছা সহানুভূতি ও সমবেদনা। আশা-নিরাশার দোলায় বিচার শেষ হল। যদিও আদালতে প্রমাণিত হয়েছিল প্রতাপের বাবা বা তার দুই স্ত্রী কেউই তার অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেয়নি, যদিও প্রতাপের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরেও রাজা তেজচন্দ্র পোরানবাবুর ছেলেকে পোষ্য নিতে যথেষ্ট ইতস্তত করেছিলেন, যদিও প্রতাপচাঁদের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান তার বাবা বা স্ত্রীরা করেননি, করে-ছিলেন পুরোহিত ঘাসিরাম, যদিও কালনায় তার মৃত্যু গভীর রহস্যে ঘেরা, তবুও বিচারপতি বললেন, প্রতাপ মৃত এ বিষয়ে তিনি সন্দেহাতীত।

প্রতাপচাঁদ তার মানসিক ভাবান্তর ও আত্মগোপন সম্পর্কে পুলিশের কাছে বলেছিল তার সৎমা বসন্তকুমারীর সঙ্গে সে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত ছিল। এই ব্যাভিচারে হঠাৎ তার মনে অপরাধ বোধ জেগে ওঠে। সে তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয় এবং পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফট করতে থাকে। পরামর্শের জন্যে একজন পণ্ডিতের কাছে গেলে তিনি তাকে বলেন, হয় জীবন বিসর্জন নয় চোদ্দ বছরের তীর্থ পরিক্রমায় এই পাপ ধুয়ে যাবে। তখন প্রতাপ দীর্ঘ চোদ্দ বছর তীর্থে তীর্থে ঘুরে নিজের জায়গায় ফিরে আসে।

প্রতাপ চাঁদকে অনেকে বলেছিল সে নদীয়ার নিরুদ্দিষ্ট কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী। সে কথা পোরানবাবুরই রটনা। সে বিষয়ে প্রধান সাক্ষী ছিলেন নদীয়ার রেভারেণ্ড জেম্‌স ডিয়ার। তিনি বললেন, আসামীর

সঙ্গে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কোন মিল নেই। কিন্তু বিচারকের সেই একই মন্তব্য: দেহগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কোন ব্যাপারই নয়। প্রতাপ মৃত একথা প্রমাণিত। আদালতে একজন মৌলভী বিচারকের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন, আসামীর পরিচয় সম্বন্ধে এখনো কিছু জানা যায় নি। সেটা যতক্ষণ উদ্‌ঘাটিত না হচ্ছে ততক্ষণ এ বিচারের রায় বের হতে পারে না। অতঃপর ১৮৩৯ সালে মতামতের জন্যে মামলাটা পাঠানো হল নিজামত আদালতে। কাগজপত্র পড়ে নিজামত আদালতের বিচারপতি ডব্লিউ ব্রাউন ও সি টাকার আসামীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগলেন। কাজীর অভিমত চাইলে কাজী বললেন, নাম ভাঁড়ানোর জন্যে আসামীর শাস্তি পাওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর একহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছ মাসের কারাবাসের আদেশ হল। এই আদেশের বিরুদ্ধে পুনর্বিচারের আবেদন জানাল সন্ন্যাসী। সে আবেদন গ্রাহ্য হল না। বর্ধমানে সে আর ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। কলকাতাতেই দিন কাটাচ্ছিল। তারপর শিখযুদ্ধ শুরু হল। তার গতিবিধির ওপর সরকারের নজর পড়ল। বিরক্ত হয়ে সে শ্রীরামপুর চলে গেল। সে সময়ে শ্রীরামপুরে ইংরেজের কর্তৃত্ব ছিল না। সেখানকার লোকজন তাকে গুরু বলে ঠাঁই দিল। ছ বছর শ্রীরামপুরে কাটিয়ে জীবনের শেষ দিকে সন্ন্যাসী কলকাতায় ফিরে আসে এবং বরানগরে আশ্রয় নেয়। ১৮৫৭ সালের শেষে অথবা '৫৮ সালের গোড়ায় সেখানেই সে দেহত্যাগ করে। কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা হয় নি। কে সেই সন্ন্যাসী? এ প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেছে।

কৃষ্ণদাস
শিবু
তারু
গোপাল
ওপি
কুমুদ
কানাই
ফকিরদাস
নেপাল দলুই

ওরা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল

উনিশশো সাত সালের ডিসেম্বরের ছ' তারিখ। হাড় কাঁপানো শীতের রাত্রি। বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইনে স্পেশাল ট্রেনে যাচ্ছিলেন লেফটেনান্ট গভর্ণর। রাত প্রায় তিনটের সময়ে নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে লাইনের ওপর ভয়ঙ্কর শব্দে বিস্ফোরণ হল। বিদ্যুৎ চমকের মত আকাশ আলোকিত হল। থর থর করে কেঁপে উঠল মাটি। ট্রেনের বিরাট ইঞ্জিনটা পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। সমস্ত গাড়িটা কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল। গাড়ির মধ্যে কেঁপে উঠলেন লেফটেনান্ট গভর্ণর। আরোহীরাও ভয়ে হতচকিত। ট্রেনে ডিউটিতে যে সব ইউরোপিও অফিসার ছিলেন তারা একে একে সবাই নেমে এলেন পিছনে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে টর্চলাইটের আলোয় তাঁরা দেখলেন লাইনের নিচে এক জায়গায় বিরাট গর্ত। বিস্ফোরণের ফলে কয়েক ফুট রেললাইন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বারুদের তীব্র গন্ধে তখনও বাতাস ভারী।

রেলগাড়ির ইঞ্জিনটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হল খড়গপুর স্টেশনে। সেই রাতেই বিশেষজ্ঞরা সেটি পরীক্ষা করলেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় পিকরিক অ্যাসিড পাওয়া গেল। বিস্ফোরণের চরিত্র মারাত্মক ধরণের।

রাত্রি শেষ হতেই তদন্তের কাজ শুরু হল। অকুস্থানের কিছু দূরে রঘুনাথপুর গ্রামে বাড়ি বাড়ি তল্লাসী হল। পুলিশ অনেক কষ্টে কিছু গোপন খবর সংগ্রহ করেছিল। রঘুনাথপুরে কৃষ্ণদাস নামে একজন লোকের বাড়ি থেকে প্রচুর গান পাউডার পাওয়া গেল। কৃষ্ণদাসের ছেলে শিবুকে পাকড়াও করে পুলিশ থানায় নিয়ে গেল। শিবুকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, এ সব মাল মশলা কোথায় পেয়েছ?

শিবু চুপ করে থাকে। কোন কথার জবাব দেয় না। তারপর প্রচণ্ড মারধোর চলতে থাকে। তিনদিন ধরে মার খাবার পর শিবু স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়। পুলিশের কাছে সে যা বিবৃতি দিয়েছিল তার সূত্র ধরে ভক্ত, গোপাল, গুপি, কুমুদ, কানাই ও ফকির দাস নামে মোট ছ'জনকে ধরে আনা হল। দলের নেতার নাম নেপাল দলুই। নারায়ণগড় থেকে নেপালকেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নিয়ে গেল মিস্টার গুড নামে এক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। নেপালের ওপর প্রতিদিন অমানুষিক অত্যাচার চলল। কোন কথাই তার মুখ থেকে বের করা গেল না। কয়েকদিন পরে জোর করে একটা স্বীকারোক্তিতে পুলিশ তাকে সই করিয়ে নেয়। তারপর ওদের হাজির করা হল মেদিনীপুর সদরের ক্রিমিনাল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

ইতিমধ্যে পুলিশ ছলে বলে কৌশলে শিবুকে হাত করেছিল। তাকে পুলিশ বলেছিল সে যদি সরকারের পক্ষে রাজসাক্ষী হতে রাজী হয় তাহলে তার ওপর থেকে সমস্ত চার্জ তুলে নেওয়া হবে এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সরকার ভাববে। সতের বছরের কিশোর শিবু সেদিন প্রলোভিত হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেদিন সে দলের লোকের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। রাজসাক্ষী হিসাবে ক্রিমিনাল প্রোসি-ডিওর কোডের তিনশো আটত্রিশ ধারা অনুযায়ী শিবু তার জবানবন্দী দিল। ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনার সব গল্প সে বললে এবং স্বীকার করল যে নেপাল দলুই এই দলের নেতা। তারই পরামর্শে ও প্ররোচনায় ওরা সবাই এই কাজে নেমেছে।

এই মামলায় প্রায় চল্লিশ জন সাক্ষীকে সরকার পক্ষ থেকে হাজির করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল ইংরেজ রাজ-

কর্মচারী। বাকি সব আমাদেরই দেশের গরীব সাধারণ মানুষ। কেউ টাকার লোভে, কেউ চাকরির লোভে, কেউ খেতাবের লোভে সেদিন ওরা আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। বিচারকের সামনে তারা বললে, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় আসামীদের সকলকে তারা নারায়নগড় স্টেশনের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। নেপালের পাশের বাড়ির একটি লোক বললে, ঘটনার দিন শেষ রাতে সে নেপালকে বাড়ি ফিরতে দেখেছে। আাপ্রুভার শিবুর দিদি নেপালের সম্পর্কীয়া শাশুড়ী হত। সেও সরকারের তরফে সাক্ষী দিয়েছিল। সরকারী উকীলের জেরায় শিবু বললে, সেই সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়ার পর নেপালের নির্দেশে আমরা তাকে অনুসরণ করি। রঘুনাথপুরে নেপালের বাড়ির কাছে একটা পুকুরের ধারে অন্ধকারে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। নেপাল বাড়িতে চলে যায় এবং বিস্ফোরক নিয়ে কিছু পরে ফিরে আসে। তারপর আমরা রেললাইনে গিয়ে আমাদের কাজ সমাধা করে চলে আসি। আমরা সবাই রেল কোম্পানীতে নিচু কাজ করি। রেল গাড়ির ক্ষতি করে আমরা ভুল করেছি।

নেপাল পুলিশের কাছে আগে বলেছিল অঘোর দাস নামে একজন সহকর্মীর সঙ্গে তার মনোমালিন্য ছিল। অঘোর রেলের শ্লিপার পরীক্ষকের কাজ করত। অঘোরকে বিপদে ফেলার জন্যে সে এই কাজ করেছে। সেই ট্রেনে গভর্নর যাবেন নেপাল তা জানত না। বিস্ফোরণের ব্যাপকতাও তার ধারণার বাইরে ছিল।

আদালত কিন্তু সেসব কথা বিশ্বাস করে নি। সাক্ষীদের কথায় এই ছবিটা ফুটে উঠেছিল যে, ঘটনার আগে, ঘটনার দিন এবং তার পরেও আসামীদের গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল। ঘটনার রাত্রে নেপাল বাড়িতে ছিল না সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেবার সময়ে বললেন, আসামীদের বয়স সতের থেকে পঁচিশের মধ্যে। তাদের বুদ্ধি পাকেনি। শিক্ষার দৌড়ও বেশিদূর নয়। এ থেকে বোঝা যায় এই দুঃসাহসিক মারণ-যজ্ঞের পেছনে ছিল অন্য কোন প্ররোচনা। নেপালের নির্দেশে অপর আসামীরা তাকে

সাহায্য করেছিল সত্যি। কিন্তু এই নৃশংস কাজের পেছনে ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্য কোন দল যাদের হাতে নেপাল ছিল একটা পুতুল মাত্র। তারাই এদের উৎসাহিত করেছে এই হিংসাত্মক কাজে। নেপাল কিন্তু এমন ধরণের কোনো কথা অদালতে বলেনি। শাস্তি পাবে জেনেও সে বলেনি কোথা থেকে সেই সংগ্রামের ডাক এসেছিল ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করলেন, সভ্য দেশে এই মারাত্মক রকমের হনন-প্রবৃত্তি গভীর নিন্দাজনক। যে দুর্ঘটনার জন্যে এই অশিক্ষিত যুবকরা ব্রতী হয়েছিল তাতে তারা সফল হতে পারে নি। কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটলে শুধুমাত্র লেফটেনাণ্ট গভর্নরেরই জীবনান্ত হত না, সেই সঙ্গে আরও বহু লোকের হত্যার অপরাধে অপরাধী হত আসামীরা। মানুষের জীবনের প্রতি দয়া, মায়া ও শ্রদ্ধার অভাব শুধুমাত্র আইনের চোখেই শাস্তিযোগ্য নয়, মানবতার দিক থেকেও যথেষ্ট নিন্দনীয়। এসব কথা বলে ম্যাজিস্ট্রেট ওদের দণ্ডের আদেশ দিলেন। নেপালের দশ বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হল। কুমুদ ও ওপি প্রত্যেকের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড। গোপাল, তারু ও ফকির প্রত্যেকের পাঁচ বছর।

মেদিনীপুর দায়রা আদালতের বিচারে ক্ষুব্ধ আসামীরা কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করল। উনিশশো আট সালের চব্বিশে আগস্ট তারিখে ওদের আপীল নিষ্পত্তি হল। বহাল রইল নিম্ন আদালতের আদেশ। দেশের স্বাধীনতায় ওদের নাম অনুক্ত থেকে গেছে। অগ্নিযুগের গণসংগ্রামে ওদের ছোট্ট ভূমিকা শুধু রয়ে গেছে আদালতের খাতার পাতায়।
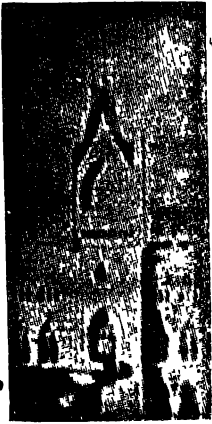
ঐতিহাসিক দানপত্র

ব্যারিস্টার রাসবিহারী ঘোষ মারা গেলেন উনিশশো একুশ সালের আটাশে ফেব্রুয়ারী। পেছনে রেখে গেলেন লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি যা বহুজনহিতায় তিনি দান করেছিলেন তাঁর ইচ্ছাপত্রটিকে একটি ঐতিহাসিক দানপত্র বলে চিহ্নিত করলে কিছুমাত্র বেশি বলা হয় না। আজকে মানুষ যেখানে আত্মকেন্দ্রিক, অপরের জন্যে সমবেদনা আর সহানুভূতি যেখানে ক্রমশই ক্ষয়মান, সেখানে তাঁর উইলখানি একটি অসাধারণ দলিল। ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি যে টাকা উপার্জন করেছিলেন তা কল্পনাতীত। রাসবিহারী ঘোষ থাকতেন তেত্রিশ নম্বর জাজেস কোর্ট রোডে। তাঁর পৈত্রিক বাস ছিল বর্ধমান জেলার তোড়কোনা গ্রামে। সেখানে তিনি এক মস্ত পুকুর খনন করিয়েছিলেন। পুকুরের নাম পদ্মপুকুর। পুকুরের ধারে বানিয়েছিলেন একটি সুদৃশ্য বাংলো। ছুটিতে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তিনি অবসর বিনোদন করতেন। তোড়কোনা গ্রামে তিনি একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করেছিলেন এবং তার সমস্ত খরচ তিনি নিজেই বহন করতেন। বাংলোর বাগানে তিনি দুটো শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি মায়ের নামে ও অপরটি বাবার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এছাড়া গ্রামের গরীব লোকদের জন্যে তাঁর

হাত সর্বদা প্রসারিত ছিল।

রাসবিহারী ঘোষের স্ত্রী-পুত্র ছিল না। তাঁর বিরাট সম্পত্তি তিনি বিভিন্ন লোককে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন। তাঁর উইলে তিনি একজিকিউটর নিযুক্ত করেছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই বিপিনবিহারী ঘোষ, হাইকোর্টের উকীল ললিতমোহন ঘোষ, অ্যাটর্নি বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর কেরাণী রামচন্দ্র ঘোষালকে। রাসবিহারীর সৎ ভাই-এর সংখ্যা ছিল পাঁচ। প্রথম বিপিনবিহারী ঘোষকে তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের সমস্ত শেয়ার এবং আইন লাইব্রেরীর সমস্ত বই দান করেছিলেন। দ্বিতীয় যোগেশচন্দ্র ঘোষকে তিনি এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তৃতীয় সুরেশচন্দ্র ঘোষের জন্য আজীবন মাসিক একশো পঞ্চাশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম অতুলকৃষ্ণ ও শরৎচন্দ্র ঘোষকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

রাসবিহারী ঘোষ তাঁর একান্ত সচিব ও কেরাণীকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। অপর কেরাণী বিধুভূষণ পালিতকে পাঁচ হাজার টাকা ও সবকনিষ্ঠ কেরাণী রামময় দত্তর জন্যে বরাদ্দ করেন দু হাজার টাকা। তাঁর দ্বিতীয় কেরাণী বিধুভূষণ পালিতের ছেলে চণ্ডীচরণ পালিতকেও তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যান। মোট কথা যত লোক তার কাছে কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের সকলের জন্যেই তিনি ভেবেছিলেন। দানের তালিকা থেকে কাউকেই তিনি বাদ দিতে চাননি। কলকাতার গোমস্তাকে তিনি দিয়েছিলেন দু হাজার, তোড়কোনার গোমস্তাকে পাঁচ হাজার। আরও দুজন সহকারী গোমস্তাকে দু হাজার ও এক হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন

রাসবিহারী ঘোষ অত্যন্ত সৌখিন লোক ছিলেন। আইনজীবি হিসাবে দিনের মধ্যে আঠার ঘণ্টা তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। অনেকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল তাঁর দেখা শোনার কাজে। তাঁর মৃত্যুর পর তাদের অনেকেই পিতৃবিয়োগের বেদনা অনুভব করেছিল। কর্মচারীদের মধ্যে চাপরাসী রামনারায়ণ পাণ্ডেকে পনেরশো টাকা

দেওয়ার কথা তিনি বলে যান। তিন জন চাকরের মধ্যে প্রথমজন চার হাজার, দ্বিতীয় একহাজার ও তৃতীয় পাঁচশো টাকা এককালীন পাবে। তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্যের স্ত্রীর জন্যে বরাদ্দ করেন আজীবন মাসিক আড়াই টাকা এবং প্রতিটি মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবে দুশো টাকা। যে সব চাকর বাকর কাজ করতে করতে মারা গেছে তাদের স্ত্রীদের জন্যে মাসে তিন টাকা হিসাবে মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। যে ব্রাহ্মণ পাচক তাঁর রান্না করত তাকে সারা জীবন মাসে পাঁচ টাকা হিসাবে দেওয়ার কথা তিনি বলে যান। ভৃত্যদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর দুবছর আগে যারা নিযুক্ত হয়েছে তারা এককালীন পাবে দুবছরের বেতনের তুল্য টাকা। এ সব ছাড়াও যে অজস্র অনুদানের কথা তিনি বলেছিলেন তার শেষ নেই। পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় বহুলোকের জন্যে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা ও সাধ্যমত সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাসবিহারী ঘোষের উইলে সবচেয়ে বড় দান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে আড়াই লক্ষ টাকার সিকিউরিটি। এই টাকার আয় থেকে তিনি একটি ট্রাভেলিং ফেলোশিপের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একজিকিউটরদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন দেড় লক্ষ টাকার গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার কিনতে এবং তোড়কোনা হাইস্কুলের সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্যে এক লক্ষ টাকা দান করতে। আইনের বই ছাড়া তাঁর লাইব্রেরীতে অন্যান্য যা বই ছিল সেসব তিনি তোড়কোনা স্কুলের গ্রন্থাগারকে দান করেন। সিমলা পাহাড়ে, পুরীতে এবং জাজেস কোর্ট রোডে রাসবিহারী ঘোষের বাড়ি ছিল আর ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি। এসবের আয় থেকে তাঁর প্রস্তাবিত সাহায্য চালিয়ে যাওয়ার কথা তিনি বলে যান। তোড়কোনার শিবমন্দিরের নিত্যপূজা এবং অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের খরচও এই আয় থেকে যেন চালিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পদ্মপুকুর ও সংলগ্ন বাগান এবং শিবমন্দির যেন চিরকাল সাধারণের জন্যে খোলা থেকে। এছাড়া ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে তিনি প্রভূত সাহায্যের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

হাইকোর্ট থেকে রাসবিহারী ঘোষের উইলের প্রোবেট নিয়ে একজিকিউটররা তাঁদের কর্তব্য যথারীতি পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ললিতমোহন মারা গেলেন উনিশশো চব্বিশ সালে, বিপিন বিহারী দেহ রাখলেন উনিশশো চৌত্রিশ সালে এবং রামচন্দ্র ঘোষাল লোকান্তরিত হলেন উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে। তখন জীবিত একজিকিউটর একমাত্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনিও তখন বয়সের ভারে জীর্ণ। তবুও কয়েকটা বছর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি এই বিরাট কর্তব্যভার চালিয়ে গিয়েছিলেন তারপর তিয়াত্তর বছর বয়সে উনিশশো একচল্লিশ সালের বাইশে এপ্রিল তারিখে স্বাস্থ্যের অজুহাতে আদালতে আবেদন করে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দায়মুক্ত হলেন। রাস বিহারী ঘোষের ট্রাস্ট ও সম্পত্তির ভার পড়ল অফিসিয়াল ট্রাস্টী অফ বেঙ্গলের হাতে।

অন্য রূপে বিধানচন্দ্র

নয়া বাংলার রূপকার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন উনিশশো বাষট্টি সালের পয়লা জুলাই তারিখে। উনিশশো উনষাট সালের আটাশে সেপ্টেম্বর ডাক্তার রায় উইল করে-ছিলেন। তাঁর উইলে সাক্ষী ছিলেন প্রবীণ অ্যাটর্নি নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও তাঁর একান্ত সচিব সরোজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। চৌত্রিশ নম্বর রোলাণ্ড রোড নিবাসী ভাইপো ব্যারিস্টার সুবিমল রায়কে তিনি একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। ছত্রিশ নম্বর নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটের বাড়িটি ছাড়া বাকি সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তিনি সুবিমল রায়কে দিয়ে যান। সুবিমল রায় ছাড়া অন্যান্য যাঁরা তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁরা হলেন বড় ভাই সুবোধচন্দ্র রায়ের অপর ছেলে সুকুমার রায় ও মেয়ে সুজাতা বসু। অগ্রজ সাধনচন্দ্র রায়ের মেয়ে রেণু চক্রবর্তী ও লোকান্তরিতা এক বোনের ছেলে দেবপ্রসাদ ঘোষ। তাঁদের তিনি কিছু দেননি। উইলের প্রোবেট নেওয়ার সময়ে তাঁরা সকলেই সম্মতি-সূচক স্বাক্ষর দিয়েছিলেন।

তেত্রিশ নম্বর রোলাণ্ড রোডে বিধানচন্দ্র ছবিঘা জমি কিনে তার ওপর একটা বাড়ি তৈরি করছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল জীবনের বাকি দিনগুলো সেখানেই কাটাবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে

গেছে। সময় মতো বাড়িটি তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। সে বাড়ি অসমাপ্ত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই বাড়িখানি তৈরির ব্যাপারে তাঁর বেশ কিছু দেনাও হয়ে গিয়েছিল। বেঙ্গল বিল্ডার্স অ্যাণ্ড ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্যান্য দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁর প্রায় ষাট হাজার টাকা দেনা হয়েছিল। উইলে এগজিকিউটরকে তিনি এই সব দেনা শোধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারে তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল কম বেশি পঁচাত্তর হাজার টাকা। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ও অন্যান্য সরকারী প্রকল্প বাবদ বিভিন্ন ডিপোজিট স্কীমে তিনি আমানত করেছিলেন প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

ডাক্তার রায় যে সময়ে উইল করেছিলেন সে সময়ে তাঁর নির্মল চন্দ্র স্ট্রীটের বাড়িটি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্সের কাছে বন্ধক ছিল। অবশ্য বেঁচে থাকতেই তিনি তাদের পাওনা শোধ করে দিয়েছিলেন এবং বসতবাড়ি ঋণমুক্ত করেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে একটি ট্রাস্ট দলিল সম্পাদন করে বাড়িটি তিনি ট্রাস্টিদের হাতে তুলে দেন। ট্রাস্টের নামকরণ হয় তাঁর বাবা ও মায়ের স্মৃতিতে অঘোর প্রকাশ ট্রাস্ট। ট্রাস্টি নিযুক্ত হন তাঁর দুই ভাইপো সুকুমার রায় ও সুবিমল রায়, শিল্পপতি ব্রিজমোহন বিড়লা, তাঁর অপর দুই ঘনিষ্ঠ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ও অমরেন্দ্রনাথ হালদার। সেই দলিলে তাদের তিনি এই মর্মে ক্ষমতা দেন তাঁরা এই সম্পত্তি যে কোন সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারবেন যাতে এই ভবনে কোন নার্সিং হোম, চিকিৎসালয়, ল্যাবরেটরী ও একসূরে ক্লিনিক খোলা হয় যা অল্প খরচের বিনিময়ে সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে। মেডিকেল ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য একটি পাঠাগারের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। তিনি বলেছিলেন, ট্রাস্ট সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় যেন দরিদ্র রোগীদের সেবার জন্যে খরচ করা হয়। ট্রাস্টিদের এই সম্পত্তি বিক্রী করার অধিকারও তিনি দিয়েছিলেন। অবশ্য তা ছিল শর্তাধীন। বিক্রয়লব্ধ টাকায় স্থানান্তরে এই ট্রাস্ট চলবে এবং তার উদ্দেশ্য যথাযথ পালন করতে হবে। আরও শর্ত ছিল, যদি কোন সদস্যের মৃত্যু হয়, যদি

কেউ অবসর গ্রহণ করেন, তাহলে সেই জায়গায় নতুন সদস্য নেওয়া হবে। যদি ট্রাস্টিদের মধ্যে কোন মতবিরোধের জন্যে সকলেই সরে দাঁড়াতে চান অথবা তাঁরা যদি এই ট্রাস্ট চালাতে অক্ষম হন তাহলে রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ট্রাস্টির হাতে যেন এই ট্রাস্ট অর্পণ করা হয়।

চিকিৎসার জগৎ ছেড়ে রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ডাক্তার রায় প্রবেশ করেছিলেন জনগণের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। কিন্তু রোগজীর্ণ মানুষের কথা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। অঘোর প্রকাশ ট্রাস্ট তারই প্রমাণ। 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।' এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। তাঁর শেষ প্রার্থনা।

রাজরোষে সজনীকান্ত
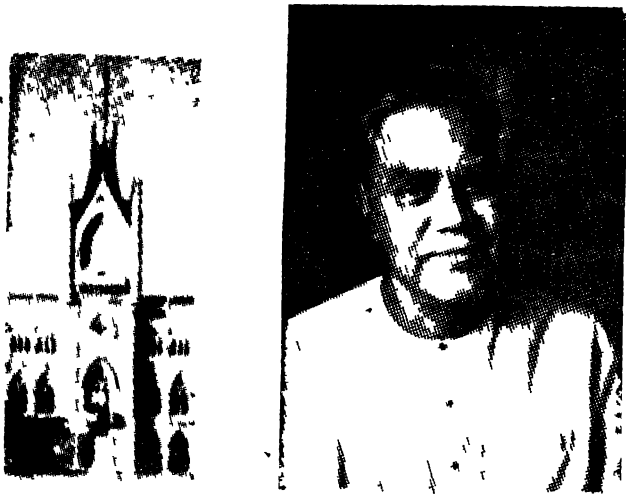
উনিশশো আটাশ সাল। ভারতে প্রবল পরাক্রমে তখন বৃটিশ শাসন চলছে। সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবাসী সোচ্চার। নেতাদের চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। অসন্তোষের আগুন সাধারণ মানুষের বুকে। অল্প দিন আগে পার্লামেন্ট স্ট্যাটুটারী কমিশন নিয়োগ করেছিল। সংবিধানের কিছু পরিবর্তনই ছিল সেই কমিশন বসানোর উদ্দেশ্য। সেই সময়ে কলকাতার প্রবাসী প্রেস থেকে একখানি বই প্রকাশিত হল ইংরেজি ভাষায়। বইখানির নাম 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ'। লেখক একজন আমেরিকান পর্যটক। তাঁর নাম জে. টি. সান্ডারল্যাণ্ড। ভারতের শোষিত জনগণের প্রতি সহানুভূতি ছিল বইখানির পাতায় পাতায়। বইখানি প্রকাশ করেছিলেন লেখক, সাংবাদিক ও সমালোচক সজনীকান্ত দাস। ভারতবর্ষকে কেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে না সেটাই ছিল এই বইয়ের বক্তব্য।

জে. টি. সান্ডারল্যাণ্ড ছিলেন প্রকৃত ভারতবন্ধু। ভারতবর্ষকে দেখার ও জানার প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে তিনি দুবার ভারতে এসেছিলেন। প্রথম আসেন আঠারশো পঁচানব্বই সালে এবং দ্বিতীয় বার উনিশশো তের সালে। প্রতিবারই

দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন শহরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি কমপক্ষে সাতখানি ভারতীয় পত্র-পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এদেশের অবস্থা দেখে তিনি বুঝেছিলেন ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও সমৃদ্ধি ভারতীয় নাগরিকের জন্যে নয়। তা শুধু ইংরেজ জাতির।

সান্ডারল্যাণ্ড ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। বৃটিশ শাসিত ভারতে আবহমানকাল ভারতীয়রা যুদ্ধ করেছে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে। দিনের পর দিন তারা দীন হতে দীনতর হয়েছে। তার মতে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের মূল কারণ অত্যধিক করভার, ভারতীয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের প্রসার লাভে বাধা। আর একটি কারণ, রাজ্য পরিচালনা ও সামরিক বাহিনীর জন্যে অহেতুক খরচ। সেই বইতে তিনি বলেছিলেন, ভারতের জনজীবনের সঙ্গে ইংরেজ জাতির সম্পর্ক খুবই কম। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে শাসন ও বিচার বিভাগে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রেই চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া আইনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বৃটিশের বিচার বহুক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট। ভারতে বৃটিশ কবর রচনা করেছে। সেখানে শান্তি নেই।

স্বাধীনতা আন্দোলনের তপ্ত লগ্নে সজনীকান্ত দাস প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া বন বণ্ডেজ' বইখানি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সরকারের বিরুদ্ধে এমন বলিষ্ঠ বক্তব্য সে যুগে ছিল কল্পনার বাইরে। বইখানি বাজারে চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নজরে পড়ল। উচ্চ মহলে বসল আলোচনার বৈঠক।

উনিশশো উনত্রিশ সালের চোদ্দই অগাস্ট তারিখে কলকাতা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। আঠারশো আটানব্বই সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির 'ক' ধারা অনুযায়ী এবং উনিশশো বাইশ ও ছাব্বিশ সালের মুদ্রণ আইন অনুযায়ী জে. টি. সান্ডারল্যাণ্ড রচিত সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হল। বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন সরকারের তরফ থেকে চীফ হুইপ ডব্লিউ. এস্ হফকিন্স। গেজেট ছাপা হওয়ার কয়েকদিন পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে অভিযোগ আনা হল। কারণ এই

বইখানির দ্বারা বৃটিশ অধিকৃত ও শাসিত ভারতে জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা হয়েছে। আপত্তিকর বইখানির প্রকাশক ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তির যোগ্য। শুনানীর পর ম্যাজিস্ট্রেট সজনী কান্তকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। সমস্ত বই বাজেয়াপ্তর আদেশ পাকাপাকিভাবে দেওয়া হল।

এই আদেশের বিরুদ্ধে সজনীকান্ত হাইকোর্টে আবেদন জানালেন বইখানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্যে। শুনানীর জন্যে বিচারপতি জি, সি র‍্যাঙ্কিন, জাহিদ সারওয়ার্দি এবং এইচ. জি. পিয়ারসন এই তিনজনকে নিয়ে একটি বিশেষ এজলাস গঠিত হল। বিচারপতিরা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে বইখানির পাঁচটা কপি চেয়ে পাঠালেন। পাতার পর পাতা উল্টে দেখলেন তাঁরা। দুপক্ষই তাদের বক্তব্য রাখলেন। বিচারপতিরা মন্তব্য করলেন যে 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' বইখানির প্রকাশনা অপরাধজনক। সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে যদি কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে তাদের সেই অভিযোগ পেশ করার জন্যে ব্যবস্থাপক সভা আছে। দেশে যখন 'প্রেস আইন' বহাল আছে তখন আপত্তিকর রচনা বাজেয়াপ্ত করা হবে। শুনানীর সময়ে সজনী-কান্ত দাসের কৌঁসুলী প্রসঙ্গক্রমে বোম্বাই হাইকোর্টের লোকমান্য তিলকের একটি মামলার কথা উল্লেখ করেন। সজনীকান্তর ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির বিষয় আলোচনা করে তার নির্দোষিতার সপক্ষে অনেক যুক্তি তিনি উপস্থিত করেছিলেন। পরিশেষে কৌঁসুলী এই কথা বলেছিলেন, বইখানিতে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে নয়, ভারতে প্রচলিত সরকারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল অন্যরকম। বিচারপতিদের অভিমত, বইখানিতে সরকারী শাসন ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের জনসাধারণকে উত্তেজিত করা। আইনের চোখে যা দণ্ডনীয়, আইনের কাছে তার ক্ষমা নেই। সজনীকান্তকে আইন ক্ষমা করেনি। বইখানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়নি। হাইকোর্ট তাঁর আবেদন নাকচ করে দিল।

রাজা রামমোহন — একটি অমূল্য দলিল

বাংলার নব জাগরণের পথিকৃৎ সে যুগের মহান বিপ্লবী রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন ইংরাজি ১৮১৮ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে। অন্যায়ের উপর ন্যায় অসাম্যের উপর সাম্যের প্রতিষ্ঠা ছিল ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম স্বপ্ন। সেদিন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম সমাজের সগর্ব ঘোষণা ছিল সমাজে নরনারীর সমান অধিকার ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। যেখানে ভক্তি সেখানে মুক্তি জাতি বিচার সমাজের এক ক্লেদাক্ত অভিশাপ। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ, শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রগতির আদর্শ। জন্মার্জিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানই ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মূলমন্ত্র।

ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শকে পূর্ণ রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে একটি অমূল্য দলিল স্বাক্ষরিত হল। কলকাতার অন্তর্গত সুতানটি অঞ্চলে ৫৫ এবং ৫৫ এক নম্বর আপার চিৎপুর রোডের বাড়িতে ব্রাহ্ম সমাজের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হল। রচিত হল সেই অমূল্য দলিল। একটি ট্রাস্ট ডীড। সেই দলিলে স্বাক্ষর দিলেন জোড়াসাঁকোর জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুর। বরাহনগর নিবাসী জমিদার

কালীনাথ রায়। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, সিমলার পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, মানিকতলা নিবাসী রামমোহন রায়, বরাহনগর নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ রায় এবং জোড়াসাঁকো নিবাসী কোম্পানীর বেনিয়ান রমানাথ ঠাকুর। এই দলিলের ট্রাস্টী নিযুক্ত হলেন বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুর। আপার চিৎপুর রোডের বাড়িটির আয়তন ছিল চার কাঠা দু ছটাক। দলিল থেকে জানা যায় সে যুগে বাড়িটির সীমানা বা চৌহদ্দি ছিল উত্তরে ফুলুরি রতনের বাড়ি, দক্ষিণে রামকৃষ্ণ করের বাড়ি ও জমি, পূর্বে রাধামণি ভামমনির বাড়ি ও জমি এবং পশ্চিমে সুতানটির রাস্তা চিৎপুর রোড।

রামমোহন তাঁর উত্তর সাধক পরম পুরুষ রামকৃষ্ণের মতোই সকল ধর্মের মূলগত ঐক্যসূত্রটি হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। বহুর মধ্যে এক খণ্ডিতের মধ্যে অখণ্ড তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। নানাবিধ জটিল আচার অনুষ্ঠান এবং পৌত্তলিকতার প্রতীক ধর্মানুষ্ঠান মানুষকে জাতিভেদের ও পরস্পর বিরোধী মতবাদের শিকার করে তুলেছে। এ কথা রামমোহনের মনে উদয় হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন সর্ব ধর্মের লোক একত্র মিলিত হয়ে এক ঈশ্বরের উপাসনা করবে। নিরাকার একেশ্বরবাদ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার ছিল রামমোহনের আদর্শ। ব্রাহ্ম সমাজের সেই ট্রাস্ট দলিলে রামমোহনের সেই আদর্শ রূপায়িত হয়েছে। দলিলের মর্ম কথা, সমাজের ভবনটি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সুস্থ ও পবিত্র চিত্তে সমাজের অনুগামীরা সেই চির নিত্য, অপরিবর্তনীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করবে। যে ঈশ্বর এই চরাচরের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা যিনি পরম পিতা, বিশ্ব বিধাতা, ত্রাতা ও মুক্তিদাতা, সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা হবে সমাজ ভবনে। কোন মূর্তি, কোন বিগ্রহ, কোন আকৃতি বা অবয়বচিত্র সমাজে শোভিত হবে না। ঈশ্বরের তুষ্টি বা ভোগের জন্য কোন হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। সমাজ ভবনে কোন জীবহত্যা কোন মতেই চলবে না। ভবনের অভ্যন্তরে কোন পশু বা জীবিত প্রাণীর প্রবেশাধিকার থাকবে না। ধর্মের জন্য বা খাদ্যের জন্য কোন পশুর প্রতিপালন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র বিশ্ববিধাতার উপাসনাই

হবে সমাজ অনুগামীদের একমাত্র ঈশ্বর চিন্তার বিষয়।

ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে রামমোহনের ট্রাস্ট দলিল গণতন্ত্রের এক সোচ্চার ঘোষণা ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেই দলিলের অন্যান্য মন্ত্র ছিল দান, সেবা, নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন, দয়া, ঈশ্বর ভক্তি, পরের হিত সাধন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর করা। রামমোহন বলেছিলেন. জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বর অনুরাগী, উন্নত নৈতিক চরিত্রেব অধিকারী যারা, কেবল মাত্র তারাই সমাজেব ট্রাস্টীপদে নিযুক্ত হওয়াব বিষযে .যাগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ট্রাস্টীদের একজন আবাসিক হতে পাবেন। সমাজ পরিচালনায় তাঁর দায়িত্বই হবে সর্বাধিক। তিনি যদি মনে করেন তাহলে দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক উপাসনার একটি সময়সূচী তিনি নির্দিষ্ট করে দেবেন।

ট্রাস্ট দলিলে একথাও বলা হয়েছিল যে ট্রাস্টীদের মধ্যে যদি কেউ কার্যকালে ইহলোক ত্যাগ কবেন অথবা ট্রাস্টীপদে থাকার অনিচ্ছা প্রকাশ করেন অথবা অন্য কোন কারণে পদমর্যাদার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হন তাহলে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায় দুই বা ততোধিক বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষীর দ্বারা সমর্থিত লিখিত পত্রে নতুন ট্রাস্টীকে গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে দলিলের বক্তব্য বিষয় ছিল যে স্বাক্ষরকারীদের সর্ব সম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে কোন ট্রাস্টীর কর্মে অবহেলা বা অন্য কোন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অপর ট্রাস্টী কোন মতেই দায়ী হবেন না। অথবা কোন জবাবদিহি তাকে করতে হবে না। পরন্ত এই ট্রাস্টের যথাযথ মর্যাদা পালনে অনুপযুক্ততাব অপরাধে যিনি অভিযুক্ত হবেন, তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য অন্যান্য ট্রাস্টীদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধা প্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুর এই ট্রাস্টীত্রয় দলিলে বর্ণিত সকল সর্তাবলী যথাযথ পালন করে যাবেন এবং যে উদ্দেশ্যে এই ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে তার শান্ত সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য

দায়াবদ্ধ থাকবেন।

এই হল আদি ব্রাহ্মসমাজের গোড়াপত্তনের ইতিহাস। ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন। তার দশ বছর পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমাজের পরিচালক গোষ্ঠীতে আসেন এবং রামমোহনের নিরাকার একেশ্বর বাদ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের আদর্শকে নবরূপে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজের বেদীমূলে এক অনির্বার্ণ দীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন। সে আর এক কাহিনী।

মহর্ষি
দেবেন্দ্রনাথ পেলেন
৯ ভাগের
৫ ভাগ

সম্পত্তি সমর্পণ

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন মারা যান তখন তাঁর তিন ছেলে বর্তমান। দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। আর দুই ছেলে নরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ শৈশবেই মারা গিয়েছিল। দ্বারকানাথের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পরে গিরীন্দ্রনাথের অকাল বিয়োগ হল। গিরীন্দ্রনাথের দুই ছেলে গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্র। গণেন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মারা যান। গুণেন্দ্রও দীর্ঘজীবি হননি। তিনটি ছেলে রেখে ১৮৮১ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁরা হলেন গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের অন্য ছেলে নগেন্দ্রনাথ স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীকে রেখে অকালে চলে গেলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তখন ঠাকুরবাড়ির সর্বময় কর্তা। সমাজে তিনি মহর্ষি আখ্যায় ভূষিত। তাঁর বাল্যশিক্ষা হয়েছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত স্কুলে। রামমোহনের ভাবধারায় তিনি শৈশবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্মের প্রধান উপাসক সমাজের নেতা ও প্রধান আচার্য রূপে তাঁর খ্যাতি। তাঁর ৮৮ বছরের দীর্ঘ জীবন সম্মানে আর সাফল্যে দীপ্ত। তাঁর নয় ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। অধিকাংশই কৃতী ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এ সৌভাগ্য নিতান্তই বিরল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এক বহুদর্শী বিচক্ষণ পুরুষ। তাঁর

একান্ন বছরের জীবন একটা ইতিহাস। সে ইতিহাস জ্ঞানের ও গরিমার। সম্মান ও সাধনার। সম্পদ ও সমৃদ্ধির। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে দ্বারকানাথ ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিলেন যদিও তখন তিনি ভোগের সাগরে ভাসমান। ছেলেদের কথা ভেবে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একটা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ট্রাস্ট দলিলে তিনি তিনজন ট্রাস্টী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা হলেন নীলকমল মুখার্জি, যদুনাথ মুখার্জি ও সত্যপ্রসাদ গাংগুলি। সেই ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল ঠাকুরবাড়ির দিনগুলো।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নয় পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক ছিলেন। ছেলেরা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পূর্ণেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বুধেন্দ্রনাথ। মেয়েদের নাম ছিল সৌদামিনী, সুকুমারী, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। ছেলেদের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র ও বুধেন্দ্র শৈশবেই মারা যায়। মেজ ছেলে হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু বাবার বুকে শক্তিশেলের মত বিঁধে-ছিল। যৌবনেই তাঁর অকাল বিয়োগ ঘটে। সঙ্গীতজ্ঞ, সুরসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হেমেন্দ্র রেখে গেলেন স্ত্রী নৃপময়ী এবং এগারটি ছেলেমেয়ে। আট মেয়েকে বাদ দিয়ে তিন ছেলের নাম হিতেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র ও ঋতেন্দ্র। মহর্ষি আমৃত্যু তাদের চিন্তায় ব্যাকুল ছিলেন।

আঠারশো সাতানব্বই সাল। জীবনের সায়াহ্নে এসে মহর্ষি দেখলেন এমন কিছু কিছু সম্পত্তি রয়ে গেছে যা তখনও যৌথ পরিবার ভুক্ত। সেগুলো হল নদীয়া, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী ও কটকে অবস্থিত সুবিশাল জমিদারীর খণ্ড খণ্ড অংশ এবং কলকাতার ১৫৫ নম্বর লোয়ার সারকুলার রোডের একটি অট্টালিকা। মহর্ষি চাইলেন এই সব সম্পত্তিতে গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রর যা অধিকার আছে তা হাইকোর্ট থেকে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হোক। এই রকম একটা ব্যবস্থা করতে পারলে মনের থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বস্তি পাবেন এবং ভবিষ্যতে কোন গোলমালেরও আশঙ্কা থাকবেনা। এই সব ভেবে তিনি পরামর্শ করলেন অ্যাটর্নি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মোহিনীমোহন মহর্ষি-পুত্র দ্বিজেন ঠাকুরের

জামাই। পরামর্শের পর হাইকোর্টে সম্পত্তি ভাগের আর্জি পেশ করা হল। ১৮৪০ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে সম্পাদিত দ্বারকানাথের ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী সম্পত্তিগুলো যেন ভাগ করে দেওয়া হয়। এছাড়া নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীর জন্যেও আমরণ একটা ভাতার ব্যবস্থা পাকা করার কথা ছিল আর্জিতে।

মহর্ষির ছেলেদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথের মাথার গোলমাল ছিল। আদালত থেকে দ্বিজেন ঠাকুর তাদের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। দ্বারকানাথের ট্রাস্টিরা আদালতে হাজির হলেন। তাঁরা বললেন, কোর্টের হস্তক্ষেপে যদি সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যায় তাহলে তাঁরা দায়মুক্ত হবেন। এ বোঝা আর তাহলে বয়ে বেড়াতে হবে না। গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র আদালতে এসে জবাব দাখিল করলেন। মহর্ষির অভিলাষে তাদের কোনই আপত্তির প্রশ্ন ওঠেনি। তবে সম্পত্তিতে ত্রিপুরাসুন্দরীর কোন অধিকার আছে এটা তাঁরা মানতে পারেননি। ১৮৫৮ সালে নগেন্দ্র মারা যাওয়ার আগে একটি উইল করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বেশির ভাগই ভাইপো গনেন্দ্রনাথকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সম্পত্তি ভাগের ব্যাপারে কারও যাতে কোন অভিযোগ না থাকে সেজন্যে মহর্ষি এই মামলায় পরিবারের সকলের নাম যুক্ত করেছিলেন যারা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয় বিভবের উত্তরাধিকারী অথবা তার সঙ্গে যুক্ত। মহর্ষির পক্ষে অ্যাটর্নি ছিলেন মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, ট্রাস্টিদের পক্ষে স্যাণ্ডারসন কোম্পানী এবং গগনেন্দ্রনাথ ইত্যাদির পক্ষে মরগ্যান অ্যাণ্ড কোম্পানী। আদালত থেকে নিযুক্ত কমিশনার সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। সেই বাঁটোয়ারা সকলেই বিনা আপত্তিতে মেনে নিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পেলেন ন'ভাগের পাঁচ ভাগ। গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র পেলেন ন'ভাগের চারভাগ। বিচারপতি জেনকিনসের এজলাসে সেই ব্যবস্থা চূড়ান্ত বহাল হল ১৮৯৮ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে।
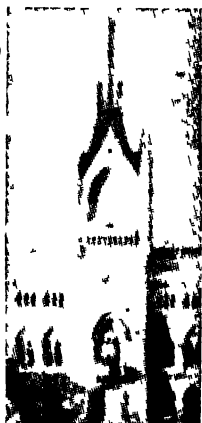
প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার নিজেই দাঁড়িয়েছিলেন উইটনেসবক্সে

[illegible] টেগোর

সে এক বিস্মৃতপ্রায় যুগ। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ছেলে গোপী-মোহন ঠাকুর অর্থে, আভিজাত্যে, মর্যাদায় তখনকার কলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক। গোপীমোহন ছয় ছেলে রেখে মারা যান বাংলা সন ১১২৫ সালে। ছেলেদের নাম সূর্যিকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। গোপীমোহন ও তাঁর ছেলেরা বিপুল পরিমাণ টাকা লোকসান দিয়েছিলেন আফিমের ব্যবসায়ে এবং মামলা মোকদ্দমায়। যে যুগে আলেকজাণ্ডার কোম্পানী ও ব্যারেটোর সঙ্গে মামলায় তাঁরা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। যাই হোক, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি সুদে আসলে উসুল করে নিয়েছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রসন্নকুমারের জন্ম আঠারশো এক সালের একুশে ডিসেম্বর। তিনি মারা যান আঠারশো একষট্টি সালের তিরিশে আগস্ট।

প্রসন্নকুমারের তিন মেয়ে সরোসুন্দরী, শ্রীসুন্দরী ও হেমসুন্দরী। একমাত্র ছেলে জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর। এই জ্ঞানেন্দ্র মোহনই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার যিনি আচারে আচরণে আহারে বিহারে ছিলেন পুরোপুরি ইংরেজ ভাবাপন্ন। বড় মেয়ে সরোসুন্দরীর বিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীনাথ মুখার্জির সঙ্গে। একমাত্র সন্তান নগেন্দ্রভূষণকে

রেখে সরোসুন্দরী অকালে মারা যায়। মেয়ের অকালমৃত্যুতে প্রসন্নকুমার খুবই ভেঙে পড়েন। নাতি নগেন্দ্র ভূষণের চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। নাবালক ছেলেটিকে কে দেখবে? এই সব কথা ভেবে মেজ মেয়ে শ্রীসুন্দরীর বিয়ে দিলেন বিপত্নীক জামাই শ্রীনাথের সঙ্গে। শ্রীসুন্দরীর কোন পুত্র সন্তান হয়নি। কাজেই নগেন্দ্র-ভূষণের আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি ছিল না। মাসীকে সে মা বলেই জানত তার ওপর ছিল দাদুর অকৃপণ স্নেহ। ছোট মেয়ে হেমসুন্দরীকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন পার্বতীচরণ চাটার্জির সঙ্গে। কিন্তু সুখ বোধ হয় প্রসন্নকুমারের ভাগ্যে লেখা ছিলনা। তাঁর জীবদ্দশায় শ্রীনাথ মারা যান। সেই শোক তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি।

প্রসন্নকুমার ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রবল ধর্মানুরাগ। সদর দেওয়ানী আদালতের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম উকীল। তাঁর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় দু'লক্ষ টাকা। আজকের দিনে একথা ভাবলে অবাক হতে হয়। হিন্দু আইনের ব্যাখার ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইন উপদেষ্টা। জমিদারী পরিচালনায় এবং নিজস্ব নানারকম ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মদক্ষ মানুষ।

শেষ জীবনে প্রসন্নকুমার খুবই ভেঙে পড়েছিলেন কয়েকটি পারিবারিক কারণে। তার মধ্যে প্রধান হল একমাত্র ছেলে জ্ঞানেন্দ্র মোহনের সঙ্গে মনান্তর। ছেলের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র মোহনের প্রথমা স্ত্রী অকালে মারা গেলে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দিশাহারা হয়ে পড়েন। কোন কিছুতেই মন নেই তার। কিছুই তার ভাল লাগে না। সেই সময়ে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। কৃষ্ণমোহন থাকতেন উত্তর কলকাতার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। সে বাড়িতে যাতায়াতের ফলে কৃষ্ণমোহনের মেয়ে কমলিনীর প্রতি জ্ঞানেন্দ্র প্রেমাসক্ত হন এবং শেষপর্যন্ত খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাকে বিয়ে করেন। এই ঘটনা

প্রসন্নকুমারের বুকে শক্তিশেলের মত বিঁধেছিল যার জন্যে ছেলেকে তিনি আমৃত্যু ক্ষমা করতে পারেননি। এমনকি কমলিনীর গর্ভজাত ছুটি ফুটফুটে ছেলে একদিন জুড়ী গাড়ীতে চেপে দাছুর কাছে হাজির হয়েছিল। সেদিনও প্রসন্নকুমার স্নেহের দৌর্বল্যকে জয় করেছিলেন। নিজের জিদ থেকে একটুও সরেননি।

আঠারশো বাষটি সালের অক্টোবর মাসে প্রসন্নকুমার উইল করলেন। তাঁর উইলের প্রথম কথা একমাত্র ছেলে জ্ঞানেন্দ্র মোহনকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। তিনি লিখলেন ছেলে জ্ঞানেন্দ্রকে আমি যা দেবার আগেই দিয়েছি। আমার এই উইলে সে কিছুই পাবে না।

প্রসন্নকুমার যখন মারা যান তখন তাঁর সম্পত্তির দাম ছিল বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। জমিদারী থেকে বার্ষিক আয় ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। কলকাতার পাথুরে ঘাটার সম্পত্তি ও অন্যান্য বাড়ি ঘর ছাড়াও রংপুর জেলায় তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। রমানাথ উপেন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দুর্গাপ্রসন্ন মুখার্জিকে তিনি সম্পত্তির অনেকটাই দিয়েছিলেন। তাঁর ছুই মেয়ের জন্যে আজীবন ছশো টাকা মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কুলদেবতার পূজো এবং উৎসবাদির জন্যে মাসে হাজার টাকা খরচ করতে বলে গিয়েছিলেন। ছুই মেয়ের পুত্র সন্তানদের জন্যে প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার এবং কন্যাসন্তানের প্রত্যেককে পচিশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন। অবশ্য সে টাকা তারা পাবে সাবালক হলে। যতদিন তারা নাবালক থাকবে ততদিন মাসে একশো টাকা হিসাবে তাদের জন্যে দেওয়া হবে। তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে নাতনিদের বিয়েতে দশ হাজার প্রতি ক্ষেত্রে খরচ করা হবে। হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র সন্তানদের জন্যে তিনি ষাট হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সবাই সমান ভাগে সেই টাকা পেয়েছিল ওকালতি ব্যবসায়ে এবং জমিদারির কাজে বেশ কিছু লোক নিয়োজিত ছিল। নায়েব, জুনিয়র মোক্তার, সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত প্রতিটি কর্মচারী ও গৃহভৃত্যদের তিনি মাস মাইনের প্রতি টাকায় একশো টাকা হিসাবে দান করার কথা উইলে

বলেছিলেন। কলকাতা জেলা দাতব্য চিকিৎসালয়কে দশ হাজার এবং কলকাতার নেটিভ হাসপাতাল বর্তমানে যা মেয়ো হাসপাতাল বলে পরিচিত সেখানে তিনি দশ হাজাব টাকা সাহাষ্য করেছিলেন। তাঁরই অনুদানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেগোর ল' প্রফেসরশিপের প্রবর্তন করা হয়। এ ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে বেশ কিছু টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রসন্নকুমার মারা যাওয়ার পর যতীন্দ্রমোহন হাইকোর্টে প্রোবেটের দরখাস্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন এগিয়ে এলেন বাধা দিতে। বাবার উইল চ্যালেঞ্জ করলেন তিনি। বিরাট এক মামলার সূত্রপাত হল। সেই মামলা আদালতের ইতিহাসে টেগোর বনাম টেগোর মামলা নামে বিখ্যাত। এই মামলায় জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পক্ষে তাঁর প্রিয়বন্ধু মাইকেল মধুসূদন ছিলেন অন্যতম ব্যারিস্টার। হাইকোর্টে এই মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ঘটনা গড়িয়েছিল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত। প্রিভি কাউন্সিল রায় দিয়েছিল যতীন্দ্র-মোহন জীবনস্বত্বে সম্পত্তি ভোগ করবেন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি ফিরে যাবে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের হাতে। তখন প্রসন্ন কুমারের সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। সেই আয় থেকে মাসে আড়াই হাজার টাকা জ্ঞানেন্দ্রকে দেওয়ার আদেশ হয়।

ইতিহাস বলে, প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরের জীবনটা সুখের সোপান বেয়ে চলেনি। জীবনে অনেক আঘাত পেয়ে গেছেন তিনি। আইন ব্যবসায়ে তিনি খুব একটা সফলতা লাভ করতে পারেন নি। পেশায় তিনি সিরিয়াস ছিলেন না। ভারতের মাটিকে বিদায় জানিয়ে লণ্ডনের কেনসিংটনে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছুদিন তিনি লণ্ডন ইউনিভারসিটিতে হিন্দু আইনের লেকচারার ছিলেন। বাকিটা অবসর জীবন। যতীন্দ্র মোহনের কাছ থেকে সম্পত্তি ফিরে পাওয়া তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। কারণ, জ্ঞানেন্দ্র মোহনের দুটি ছেলেই অকালে মারা যায়। যতীন্দ্র মোহন মারা যাওয়ার উনিশ বছর আগে জ্ঞানেন্দ্রর মৃত্যু হয়। দুঃখ বেদনা আর হতাশায় একটা সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মামলাচক্রে কালীপ্রসন্ন

কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন সে যুগের এক প্রবাদ পুরুষ। এ যুগের ইতিহাসেও এখনও তিনি ভাস্বর। অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ ও অপরিমেয় দানশীলতার জন্যে বাঙালার মনে ও বাঙলার সংস্কৃতির জগতে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। মহাভারতের অনুবাদ তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে তিনি একাজ সমাধা করেছিলেন এবং তা বিনা পয়সায় বিতরণ করেছিলেন সুধীজনকে। ১৮৫৬ সালে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে বিক্রমোর্বশীর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। পরের বছর বাড়িতে তিনি বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি রেভারেণ্ড জেমস্ লং এর জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন। নীলকর সাহেব আর্চিবল্ড হিল্‌স যখন হরিশ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় ক্ষতি পূরণের ডিক্রী পেয়েছিলেন, সে টাকাও দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন। তাছাড়া হরিশের হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখতে তিনি অকাতরে টাকা ঢেলে-ছিলেন। বাংলা মাসিকপত্র বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং হুতোম প্যাঁচার

নক্সা তার অন্য স্মরণীয় কীর্তি। মাত্র ২৯ বছরের স্বল্প জীবনে তিনি যা করে গেছেন তা ভাবলে অবাক লাগে।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন বনেদী কলকাতার সে যুগের এক চমক লাগানো জমিদার। তাঁর প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ মুর্শিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ান ছিলেন। কলকাতার চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, সার্কুলার রোড, বারানসী ঘোষ স্ট্রীট ও চাষা ধোপা পাড়ায় ওদের বহু সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এত কিছু থেকেও কালীপ্রসন্নর শেষ জীবনটা প্রচণ্ড অর্থকষ্টে কেটেছিল। সম্ভ্রম বাঁচাতে তিনি দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়িয়েছেন। পাওনাদারের দল তাঁকে তাড়া করেছে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। একজনের ধার শোধ করতে আর একজনের শিকার হয়েছিলেন। কোন্ পথে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর বিপুল পরিমাণ অর্থ? আজ নতুন করে কালীপ্রসন্নর মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোন পাপে, কোন অভিশাপে বিচার বিবেচনার কোন ভুলে তিনি তলিয়ে গেলেন তার পূর্ণ ইতিহাস লেখা হয় নি। আদালতের কাগজপত্র থেকে সামান্য যা এপর্যন্ত জানা গেছে তা হল অনাদায়ী টাকার জন্যে বহু মামলা তাঁর নামে দায়ের হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে হয় হাত চিঠিতে নয় দলিল জমা রেখে প্রচুর টাকা তিনি ধার করেছেন। একের পর এক ডিক্রী হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি আদালতে হাজির হননি। গরহাজিরে এক তরফা বিচার হয়ে গেছে। কেন তিনি কোন রফায় এলেন না? সে কি সম্মানের জন্যে? কিন্তু সম্মান তো তিনি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। চরম অপমানের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। শুধুমাত্র ১৮৬৬ সালেই তাঁর নামে প্রায় কুড়িটি মামলা রুজু হয়েছিল। পাওনা টাকার পরিমাণ লক্ষাধিক। মামলা করেছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র সিং, টি. স্মিথ, পার্ক পিটার, দ্বারকা নাথ মিত্র, ধর্মদাস মল্লিক, নগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, প্রতাপ চাঁদ জহুরী, কালী কুমার ঘোষ, গিরিশ চন্দ্র দাস, নবীন চন্দ্র ঘোষ, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, মাতঙ্গিনী দেবী, জেমস্ ম্যাকিনটস, সুরেশ চন্দ্র ঘোষ এবং আরও কয়েকজন।

পিটার পার্ক এবং টমাস অ্যালকক ১১ নম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস

স্ট্রীটে জুয়েলারীর ব্যবসা চালাত। তাদের ফার্মের নাম ছিল চার্লস অ্যাণ্ড নেফিউ। কালীপ্রসন্ন ওদের কাছে তিন হাজার টাকার জড়োয়ার গয়না কিনেছিলেন। প্রায় বছর খানেক অপেক্ষা করেও যখন টাকা পাওয়া গেল না তখন ওরা হাইকোর্টে নালিশ ঠুকে দিল। কালীপ্রসন্ন হাজির হলেন না। ১৮৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে ওয়াল্‌টার মরগ্যানের এজলাসে মামলা ডিক্রী হয়ে গেল।

প্রতাপ চাঁদ জহুরী সেকালে একজন নামকরা সুদের কারবারী ছিল। তাছাড়া সোনারূপো মণিমাণিক্যের কারবারও তার ছিল। থাকত বড়বাজারের বাঁশতলা গলিতে। ১৮৬৫ সালের শেষের দিকে এবং ৬৬ সালের গোড়ায় কয়েকখানি হাত চিঠিতে কালীপ্রসন্ন প্রতাপচাঁদের কাছে বিশ হাজারেরও বেশি ধার করেছিলেন। প্রতাপচাঁদ দেখল ইতিমধ্যে কয়েকটি মামলায় কালীপ্রসন্ন জড়িত। দেরি করলে টাকা আদায় করা হয়ত মোটেই সম্ভব হবে না। সুতরাং সে নালিশ করল হাইকোর্টে। কালীপ্রসন্ন হাজির হলেন না। বিচারপতি আর্থার জন ম্যাকফারসনের এজলাসে মামলা ডিক্রী হয়ে গেল। আদালতের আদেশে কালীপ্রসন্নর বারানসী ঘোষ স্ট্রীটের কয়েকখানা বাড়ি ক্রোক করা হল। শেরিফের অফিস থেকে বাড়ি গুলো বিক্রীর নোটিশও ছাপা হয়ে গেল খবরের কাগজে। তখন কালীপ্রসন্নর হুঁস হল। তিনি প্রতাপচাঁদকে অনুরোধ করলেন নীলাম আপাতত স্থগিত রাখতে। অবিলম্বে তিনি টাকার ব্যবস্থা করবেন এবং অন্য পাওনাদারদের সঙ্গে একটা রফায় আসবেন। সেই কথায় নির্ভর করে প্রতাপচাঁদ বাড়ি বিক্রী স্থগিতের জন্যে আবেদন করেছিল। কিন্তু একবছর অপেক্ষা করেও অবস্থার কোন উন্নতি না দেখে আবার সে এগিয়ে গেল ডিক্রী জারী করতে। আটক করা হল বারানসী ঘোষ স্ট্রীটের দুখানা বাড়ি, চাষা ধোপা পাড়ার দুখানা বাড়ি এবং বাগবাজারের একটা খালি জমি। কিন্তু গোলমাল বাধল বারানসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ি দুটো নিয়ে। উদয়চাঁদ, প্রাণকৃষ্ণ, গোকুলচাঁদ ও নবকুমার মুখার্জি নামে চারজন এগিয়ে এসে বললে ওই সম্পত্তির মালিক তারা। ওতে কালীপ্রসন্নর কোন হক নেই।

কাগজপত্রও তাদের কাছে ছিল। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে অন্য সম্পত্তির ওপর নজর দিতে হল।

ওদিকে আহিরিটোলার মাতঙ্গিনী দেনা হাওয়া খারাপ দেখে কালীপ্রসন্নর নামে মামলা করে দিলেন। সে মামলাতেও কালীপ্রসন্ন হাজির হলেন না। বিচারপতি ম্যাকফারসনের এজলাসে ১৮৬৬ সালের ২ জুলাই তারিখে মামলা ডিক্রী হয়ে গেল। টাকার অঙ্ক ষোল হাজার পাঁচশো দশ। মাতঙ্গিনী সেই ডিক্রীর বলে কালীপ্রসন্নর সম্পত্তি ক্রোক করে বসলেন। কিন্তু টাকা আদায় হবে কি করে? অন্যান্য মামলায় সবকিছু আগে থেকেই আটক করা আছে। মাতঙ্গিনীর অ্যাটর্নি ওয়েন অ্যাণ্ড ব্যানার্জি অনেক খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল যে ১/১ রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটা তখনও পাওনাদারদের নাগালের বাইরে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটা আটক করার আদেশ নিল আদালত থেকে। কিন্তু তা থেকে টাকা উসুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কালীপ্রসন্নর সম্পত্তির অবস্থা সম্বন্ধে জানা গেল ১৫ ও ৯২ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, ২৫ চৌরঙ্গীর বেঙ্গল ক্লাব, কীড্ স্ট্রীটের বাড়ি প্রতাপ জুহুরী আটক করেছে। ব্রজবন্ধু মল্লিক ৫৬ লোয়ার সার্কুলার রোড, জেম্স নিউটন, ভৈরবচন্দ্র রায়, নগেন্দ্র কুমার ঘোষ, ধর্মদাস মল্লিক অন্যান্য সম্পত্তি আটক করে বসে আছে।

একসঙ্গে এতগুলো মামলা চলতে থাকায় সমস্ত ব্যাপারটাই জটিল হয়ে উঠল। তার ওপর প্রতাপচাঁদ একটা দলিল হাজির করল। ১৮ এপ্রিল ১৮৬৬ সালে কালীপ্রসন্ন তাঁর অনেকগুলো সম্পত্তি প্রতাপ জহুরীকে বিক্রী কোবালা লিখে দিয়েছেন। কালীপ্রসন্নর কাছে প্রতাপ জহুরীর পাওনা তখন লক্ষাধিক টাকা। তারই জন্যে এই দলিল। এ খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনী, জি. টি. রিবেরো এবং কালীকুমার ঘোষ ছুটে এল। আদালতে ওরা দরখাস্ত করল। ওরা বললে, অন্য পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়ার জন্যে এই বিক্রী কোবালা। সেটা নাকচ হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, এই দলিল সই হওয়ার আগেও অনেকগুলো মামলায় ডিক্রি হয়ে গেছে। সুতরাং এই দলিলের কোন দাম নেই।

তখন নতুন করে কালীপ্রসন্নর সম্পত্তির ওপর রিসিভার বসল। সব সম্পত্তি রইল হাইকোর্টের হেফাজতে। একের পর এক সম্পত্তি বিক্রী করে পাওনাদারদের টাকা মেটানো হল। রিসিভার রবার্ট বেলচেমবার্স টাকা বাঁটোয়ারা করতে হিমসিম খেয়ে গেলেন। যারা বেশি তৎপর তারা টাকা পেয়ে গেল। আবার কারো কারো টাকা অনাদায়ী রয়ে গেল। এমনি একজন পাওনাদার সিমলার কালীকুমার ঘোষ। কালীকুমার মামলা রুজু করেছিল ১৮৬৬ সালে স্যানডারসন অ্যাণ্ড ফার্গুসন অ্যাটর্নির অফিস থেকে। সেই বছর ২৬ মার্চ তারিখে ছ'হাজার টাকার ডিক্রীও পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় সম্পত্তি আটক করেও তার টাকা আদায় হল না। কারণ কালীপ্রসন্নর অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তিগুলো ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের শেরিফ বিক্রী করে অন্য পাওনাদারদের দেনা মিটিয়েছিল। দীর্ঘ চার বছর ধরে টাকা আদায়ে অপারগ হয়ে কালীকুমারের মাথায় জিদ চেপে গেল। শুরু হল কালীপ্রসন্ন সিংহের মান ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি। কালী-প্রসন্নর নামে ওয়ারেন্ট জারী হল। শেরিফ তাঁকে ১৮৭০ সালের মার্চ মাসের ২২ তারিখে বিচারপতি মার্কবির কাছে হাজির করল। ব্যারিস্টার উডরফ তাঁর জবানবন্দী নিলেন বিচারপতির সামনে। সেদিনের সেই দৃশ্য কল্পনায় আনলে আজ দেহ শিহরিত হয়ে ওঠে। কলকাতার অন্যতম ধনী-শ্রেষ্ঠ, বিদ্যায়, জ্ঞানে এক কৃতিপুরুষ, মহা-ভারতের অনুবাদক, কলকাতা কালচারের পুরোধা টাকার জন্যে আত্মসমর্পণ করলেন আদালতে। এবং তা সামান্য টাকা। যে টাকার বহুগুণ তিনি দান করেছেন, নষ্ট করেছেন বিলিয়ে দিয়েছেন তার জন্যে সেই মহাপ্রাণের কী নিদারুণ পরিণতি। তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাইকোর্টে নিয়ে আসা হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সেদিন তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন, আমার যা কিছু আছে সবই রিসিভারের হাতে। আমার নিজের কাছে কিছুই নেই। রিসিভারের কাছে যা আছে আমার দেনা শোধের পক্ষে সেটা আমি যথেষ্ট বলে মনে করি।

বিচারপতি ম্যাকফারসন কালীপ্রসন্নকে মুক্তি দিলেন। কোন

লাভ নেই এই স্বনামখ্যাত মানুষটিকে জেলে পাঠিয়ে। সুদখোরের দল তাঁর সব কিছু গ্রাস করেছে। এখন তাঁর সম্মান নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। একথা বুঝতে বিচারপতির কোন অসুবিধা হয়নি। লজ্জায় অপমানে কালীপ্রসন্ন নিশ্চয়ই সেদিন অধোবদন হয়েছিলেন। সেই অপমান সহ্য করতে কতখানি বেদনা তিনি পেয়েছিলেন সে কথা ভাবতে আজ কষ্ট লাগে। তখন তিনি জীবন যুদ্ধে পরাজিত রিক্ত হৃতসর্বস্ব এক জমিদার যার তকদির চলে গেছে, তকমা আছে, সম্মান চলে গেছে অপমান ছুটে আসছে, বিভব নেই পরাভব পদে পদে। যাই হোক, এই ঘটনার পর কালীপ্রসন্ন আর বেশিদিন বেঁচে থাকেননি। ১৮৭০ সালের ২৪ জুলাই তারিখে নিঃসন্তান কালীপ্রসন্ন সিংহ ইহলোক ত্যাগ করেন। রেখে গেলেন যুবতী বিধবা শরৎকুমারী দাসীকে। কালীকুমার ঘোষ শরৎকুমারীকে টেনে আনল মামলার মধ্যে। খোঁজ করতে লাগল কালীপ্রসন্নর অবিক্রীত সম্পত্তি কী অবশিষ্ট আছে। কালীপ্রসন্নর অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ উইল করে তার নামে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং জ্ঞাতি ভাই যাদবকৃষ্ণ যখন মারা যান তখন কিছু সম্পত্তি যৌথ মালিকানায় ছিল। কালীকুমার কোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা আদায় করলেন যে হরচন্দ্রের উত্তরাধিকারী প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী পদ্মমণি দাসী কোন টাকাকড়ি খরচ করতে পারবেন। এবং যাদবকৃষ্ণ সিংহর দুই বিধবা স্ত্রী ফুলকুমারী দাসী ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসী কোন কোম্পানীর কাগজ ভাঙাতে পারবে না। যাদবকৃষ্ণর সঙ্গে যে সব যৌথ সম্পত্তিগুলো কালীপ্রসন্নর ছিল সেগুলো হল ৯ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, ১০ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট ও ৪ সুকিয়া স্ট্রীট। প্রথম দুটিতে কালীপ্রসন্নর সাত আনা হিসাবে অংশ ছিল এবং শেষেরটিতে ছিল চার আনা অংশ। সে সব সম্পত্তিও আটক করার নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কালীকুমার ঘোষ টাকার মুখ দেখে যেতে পারেনি। ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে কালীকুমারের মৃত্যু হয়। তার জায়গায় মামলায় নতুন নাম যুক্ত হয় সৌদামিনী দাসী ও তিন ছেলে মনোমোহন, গোপীমোহন ও প্রেমমোহন শেষের দুটি নাবালক।

ওরাও উঠে পড়ে লাগল টাকা আদায় করার জন্যে। যে সব গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে হরচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কালীপ্রসাদের যৌথ মালিকানা ছিল সেগুলো বিক্রী করে কালীকুমারের দেনা শোধ করল শরৎকুমারী। সময়টা ১৮৭৭ সাল। কালীপ্রসন্ন তার ঢের আগে চলে গেছেন অন্য জগতে। চলে গেছেন সব দেনা পাওনার বাইরে।